

इतिहास



विष्णुनाथराव



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

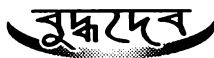
কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

बुद्धदेव





ভগবান বুদ্ধের সার্থদ্বিসাহস্রিক পরিনির্বাণ
জয়ন্তী উপলক্ষে —

প্রথম প্রকাশ :

বৈশাখী পূর্ণিমা ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩

পুনর্মুদ্রণ :

ভাদ্র ১৩৬৭

মাঘ ১৩৭৯

বৈশাখ ১৩৯২

আষাঢ়ী পূর্ণিমা ১৪১১

পরিবেশনায় :

কল্যাণ বড়ুয়া

সত্ত্বাধিকারী

প্রজ্ঞা প্রিন্টার্স

২৫, নজির মার্কেট, এন, এ চৌধুরী রোড,

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন : ৬২০৪৫১, ৬২৭৯০৯

মোবাইল : ০১১-৭৬৩৩৪৫

জিনাংসু বড়ুয়া

অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা

চট্টগ্রাম সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার

১২১, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮৯-৬৩০২৯৫

বুদ্ধদেব

शुभम्

[illegible]

বুদ্ধদেব

সূচীপত্র

প্রার্থনা

প্রবেশক

বুদ্ধদেব

ব্রহ্মবিহার

বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ

বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ

বুদ্ধজন্মোৎসব

সকলকলুষতামসহর

বুদ্ধদেবের প্রতি

বোরোবুদুর

সিয়াম : প্রথম দর্শনে

বুদ্ধদেব

বুদ্ধদেব

আমি যাকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলদ্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলংকার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার বার সমর্পন করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।

একদিন বুদ্ধগয়াতে গিয়েছিলাম মন্দির দর্শনে, সেদিন এই কথা আমার মনে জেগেছিল— যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে ভ্রমণ করছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাই নি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করি নি?

তখনি আবার এই কথা মনে হল যে, বর্তমান কালের পরিধি অতি সংকীর্ণ, সদ্য উৎক্ষিপ্ত ঘটনার ধূলি-আবর্তে আবিল, এই অল্পপরিসর অস্বচ্ছ কালের মধ্যে মহামানবকে আমরা পরিপূর্ণ করে উপলদ্ধি করতে পারি নে ইতিহাসে বার বার তার প্রমাণ হয়েছে। বুদ্ধদেবের জীবিতকালে ক্ষুদ্র মনের কত ঈর্ষা, কত বিরোধ তাঁকে আঘাত করেছে; তাঁর মাহাত্ম্য খর্ব করবার জন্য কত মিথ্যা নিন্দার প্রচার হয়েছিল। কত শত লোক যারা ইন্দ্রিয়গতভাবে তাঁকে কাছে দেখেছে তারা অন্তরগতভাবে নিজেদের থেকে তাঁর বিপুল দূরত্ব অনুভব করতে পারেনি, সাধারণ লোকালয়ের মাঝখানে থেকে তাঁর অলৌকিকত্ব তাদের মনে প্রতিভাত হবার অবকাশ পায় নি। তাই মনে করি, সেদিনকার প্রত্যক্ষ ধাবমান ঘটনাবলীর অস্পষ্টতার মধ্যে তাঁকে যে দেখি নি সে ভালোই হয়েছে। যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা জন্মমুহূর্তেই স্থান গ্রহণ করেন মহাযুগে, চলমান কালের অতীত কালেই তাঁরা বর্তমান, দূরবিস্তীর্ণ ভারী কালে তাঁরা বিরাজিত। এ কথা সেদিন বুঝেছিলুম সেই মন্দিরেই। দেখলুম, দূর জাপান থেকে সমুদ্র পার হয়ে একজন দরিদ্র মৎস্যজীবী এসেছে কোনো দুষ্টকৃতির অনুশোচনা করতে। সায়াফ্ উত্তীর্ণ হল নির্জন নিঃশব্দ মধ্যরাত্রিতে, সে একাগ্রমনে

বুদ্ধদেব

করজোড়ে আবৃত্তি করতে লাগলঃ আমি বুদ্ধের শরণ নিলাম। কত শত শতাব্দী হয়ে গেছে, একদা শাক্যরাজপুত্র গভীর রাত্রে মানুষের দুঃখ দূর করবার সাধনায় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন; আর সেদিনকার সেই মধ্যরাত্রে জাপান থেকে এল তীর্থযাত্রী গভীর দুঃখে তাঁরই শরণ কামনা করে। সেদিন তিনি ঐ পাপপরিতপ্তের কাছে পৃথিবীর সকল প্রত্যক্ষ বস্তুর চেয়ে প্রত্যক্ষতম, অন্তরতম; তাঁর জন্মদিন ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে ঐ মুক্তিকামীর জীবনের মধ্যে। সেদিন সে আপন মনুষ্যত্বের গভীরতম আকাজক্ষার দীপ্তশিখায় সম্মুখে দেখতে পেয়েছে তাঁকে যিনি নরোত্তম। যে বর্তমান কালে ভগবান বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল সেদিন যদি তিনি প্রতাপশালী রাজরূপে, বিজয়ী বীররূপেই প্রকাশ পেতেন, তা হলে তিনি সেই বর্তমান কালকে আভিভূত করে সহজে সম্মান লাভ করতে পারতেন; কিন্তু সেই প্রচুর সম্মান আপন ক্ষুদ্র কালসীমার মধ্যেই বিলুপ্ত হত। প্রজা বড়ো করে জানত রাজাকে, নির্ধন জানত ধনীকে, দুর্বল জানত প্রবলকে— কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণতাকে সাধনা করছে যে মানুষ সেই স্বীকার করে, সেই অভ্যর্থনা করে মহামানবকে। মানব-কর্তৃক মহামানবের স্বীকৃতি মহাযুগের ভূমিকায়। তাই আজ ভগবান বুদ্ধকে দেখছি যথাস্থানে মানবমনের মহাসিংহাসনে মহাযোগের বেদীতে, যার মধ্যে অতীত কালের মহৎপ্রকাশ বর্তমানকে অতিক্রম করে চলেছে। আপনার চিন্তাবিকারে আপন চরিত্রের অপূর্ণতায় পীড়িত মানুষ আজও তাঁরই কাছে বলতে আসছে: বুদ্ধের শরণ কামনা করি। এই সুদূর কালে প্রসারিত মানবচিন্তার ঘনিষ্ঠ উপলব্ধিতেই তাঁর যথার্থ আবির্ভাব।

আমরা সাধারণ লোক পরস্পরের যোগে আপনার পরিচয় দিয়ে থাকি; সে পরিচয় বিশেষ শ্রেণীর, বিশেষ জাতির, বিশেষ সমাজের। পৃথিবীতে এমন লোক অতি অল্পই জন্মেছেন যারা আপনাতেই স্বতই প্রকাশবান্, যাদের আলোক প্রতিফলিত আলোক নয়, যারা সম্পূর্ণ প্রকাশিত আপন মহিমায়, আপনার সত্যে। মানুষের খণ্ড প্রকাশ দেখে থাকি অনেক বড়ো লোকের মধ্যে; তাঁরা জ্ঞানী, তাঁরা বিদ্বান, তাঁরা বীর, তাঁরা রাষ্ট্রনেতা; তাঁরা মানুষকে

চালনা করেছেন আপন ইচ্ছামত; তাঁরা ইতিহাসকে সংগঠন করেছেন আপন সংকল্পের আদর্শে। কেবল পূণ্য মনুষ্যত্বের প্রকাশ তাঁরই, সকল দেশের সকল কালের মানুষকে যিনি আপনার মধ্যে অধিকার করেছেন, যাঁর চেতনা খন্ডিত হয়নি রষ্ট্রগত জাতিগত দেশকালের কোনো অভ্যস্ত সীমানায়।

মানুষের প্রকাশ সত্যে। এই সত্য যে কী তা উপনিষদে বলা হয়েছে : আত্মবৎ সর্বভূতেষু য পশ্যতি স পশ্যতি। যিনি সকল জীবকে আপনার মতো করে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। আপনার মধ্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়েছে, তিনি আপন মানব-মহিমায় দেদীপ্যমান।

যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি

চাত্মানং সর্বভূতেষু ন ততো বিজুগুপ্সতে।

সকলের মধ্যে আপনাকে ও আপনার মধ্যে সকলকে যিনি দেখতে পেয়েছেন, তিনি আর গোপন থাকতে পারেন না, সকল কালে তাঁর প্রকাশ।

মানুষের এই প্রকাশ জগতে আজ অধিকাংশ লোকের মধ্যে আবৃত। কিছু কিছু দেখা যায়, অনেকখানি দেখা যায় না। পৃথিবী সৃষ্টির আদ্যুগে ভূমণ্ডল ঘন বাষ্প-আবরণে আচ্ছন্ন ছিল। তখন এখানে সেখানে উচ্চতম পর্বতের চূড়া অবারিত আলোকের মধ্যে উঠতে পেরেছে। আজকের দিনে তেমনি অধিকাংশ মানুষ প্রচ্ছন্ন, আপন স্বার্থে, আপন অহংকারে, অবরুদ্ধ চৈতন্যে। যে সত্যে আত্মার সর্বত্র প্রবেশ সেই সত্যের বিকাশ তাদের অপরিণত।

মানুষের সৃষ্টি আজও অসম্পূর্ণ হয়ে আছে। এই অসমাপ্তির নিবিড় আবরণের মধ্যে থেকে মানুষের পরিচয় আমরা পেতুম কী করে যদি না মানব সহসা আমাদের কাছে আবির্ভূত হত কোনো প্রকাশবান্ মহাপুরুষের মধ্যে? মানুষের সেই মহাভাগ্য ঘটেছে, মানুষের সত্যস্বরূপ দেদীপ্যমান হয়েছে ভগবান বুদ্ধের মধ্যে, তিনি সকল মানুষকে আপন বিরাট হৃদয়ে গ্রহণ করে দেখা দিয়েছেন। ন ততো বিজুগুপ্সতে— আর তাঁকে গোপন করবে কিসে, দেশকালের কোন্ সীমাবদ্ধ পরিচয়ের অন্তরালে, কোন্ সদ্য প্রয়োজনসিদ্ধির প্রলুব্ধতায়?

ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে-দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করে নি, এইজন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশ-বিদেশের সকল জাতির কাছে। এল চীন ব্রহ্মদেশ জাপান, এল তিব্বত মঙ্গোলিয়া। দুস্তর গিরি-সমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অমোঘ সত্যবর্তার কাছে। দূর হতে দূরে মানুষ বলে উঠল, মানুষের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি—মহাস্তং পুরুষং তমসং পরস্তাং। এই ঘোষণাবাক্য অক্ষয় রূপ নিল মরুপ্রান্তরে প্রস্তরমূর্তিতে। অদ্ভুত অধ্যবসায়ে মানুষ রচনা করলে বুদ্ধ-বন্দনা, মূর্তিতে, চিত্রে, স্তম্ভে। মানুষ বলেছে, যিনি অলোকসামান্য দুঃসাধ্য সাধন করেই তাঁকে জানাতে হবে ভক্তি। অপূর্ব শক্তির প্রেরণা এল তাদের মনে; নিবিড় অন্ধকারে গুহাভিত্তিতে তারা আঁকল ছবি, দুর্বহ প্রস্তরখণ্ডগুলোকে পাহাড়ের মাথায় তুলে তারা নির্মাণ করলে মন্দির, শিল্প-প্রতিভা পার হয়ে গেল সমুদ্র, অপরূপ শিল্পসম্পদ রচনা করলে, শিল্পী আপনার নাম করে দিলে বিলুপ্ত, কেবল শাস্বত কালকে এই মন্ত্র দান করে গেল : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। জাভাদ্বীপে বরোবুদরে দেখে এলুম সুবৃহৎ স্তম্ভ পরিবেষ্টন করে শত শত মূর্তি খুদে তুলেছে বুদ্ধের জাতক-কথার বর্ণনায়; তার প্রত্যেকটিতেই আছে কারুনৈপুণ্যের উৎকর্ষ, কোথাও লেশমাত্র আলস্য নেই, অনবধান নেই; এ'কে বলে শিল্পের তপস্যা, একই সঙ্গে এই তপস্যা ভক্তির—খ্যাতি-লোভহীন নিষ্কাম কৃচ্ছসাধনায় আপন শ্রেষ্ঠশক্তিকে উৎসর্গ করা চিরবরণীয়ের চিরস্মরণীয়ের নামে। কঠিন দুঃখ স্বীকার করে মানুষ আপন ভক্তিতে চরিতার্থ করেছে; তারা বলেছে, যে প্রতিভা নিত্যকালের সর্বমানবের ভাষায় কথা বলে সেই অক্পণ প্রতিভার চূড়ান্ত প্রকাশ না করতে পারলে কোন্ উপায়ে যথার্থ

করে বলা হবে 'তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে সকল কালের জন্যে'? তিনি মানুষের কাছে সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন, যা দুঃসাধ্য, যা চিরজাগরুক, যা সংগ্রামজয়ী, যা বন্ধনছেদী। তাই সেদিন পূর্ব মহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্যবান পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর জয়ধ্বনি, শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তরে, নির্জন গুহায়। এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস ধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে।

এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনোদিন দেখা দিয়েছে! সেই রাজাকে মাহাত্ম্য দান করেছেন যে গুরু তাঁকে আহ্বান করবার প্রয়োজন আজ যেমন একান্ত হয়েছে এমন সেদিনও হয় নি যেদিন তিনি জন্মেছিলেন এই ভারতে। বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকর্ষিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষকলুষিত হতভাগ্য দেশে। পূজার বেদীতে আবির্ভূত হোন মানবশ্রেষ্ঠ, মানবের শ্রেষ্ঠতাকে উদ্ধার করবার জন্যে। সকলের চেয়ে বড়ো দান যে শ্রদ্ধাদান, তার থেকে কোনো মানুষকে তিনি বঞ্চিত করেন নি। যে দয়াকে, যে দানকে ধর্ম বলেছেন সে কেবল দূরের থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে অর্থদান নয়, সে দান আপনাকে দান- যে দান ধর্মে বলে 'শ্রদ্ধা দেয়ম্'। নিজের শ্রেষ্ঠতাভিমান, পুণ্যাভিমান, ধনাভিমান প্রবেশ করে দানকে অপমানকর অধর্মে পরিণত করতে পারে এই ভয়ের কারণ আছে; এইজন্যে উপনিষদ্ বলেন : ভিয়া দেয়ম্। ভয় করে দেবে। যে ধর্মকর্মের দ্বারা মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবার আশঙ্কা আছে তাকেই ভয় করতে হবে। আজ ভারতবর্ষে ধর্মবিধির প্রণালীযোগে মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধার পথ চারি দিকে প্রসারিত হয়েছে। এরই ভয়ানকত্ব কেবল আধ্যাত্মিক দিকে নয়, রাষ্ট্রীয়

মুক্তির দিকে সর্বপ্রধান অন্তরায় হয়েছে এই প্রত্যক্ষ দেখছি। এই সমস্যার কি কোনোদিন সমাধান হতে পারে রাষ্ট্রনীতির পথে কোনো বাহ্য উপায়ের দ্বারা?

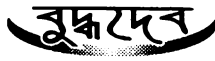
ভগবান বুদ্ধ একদিন রাজসম্পদ ত্যাগ করে তপস্যা করতে বসেছিলেন। সে তপস্য সকল মানুষের দুঃখ-মোচনের সংকল্প নিয়ে। এই তপস্যার মধ্যে কি অধিকারভেদ ছিল? কেউ ছিল কি শ্লেচ্ছ? কেউ ছিল কি অনার্য? তিনি তাঁর সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন দীনতম মূর্খতম মানুষেরও জন্য। তাঁর সেই তপস্যার মধ্যে ছিল নির্বিচারে সকল দেশের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা। তাঁর সেই এত বড়ো তপস্যা আজ কি ভারতবর্ষ থেকে বিলীন হবে?

জিজ্ঞাসা করি, মানুষে মানুষে বেড়া তুলে দিয়ে আমরা কী পেয়েছি ঠেকাতে? ছিল আমাদের পরিপূর্ণ ধনের ভান্ডার; তার দ্বার, তার প্রাচীর, বাইরের আঘাতে ভেঙে পড়ে নি কি? কিছু কি তার অবশিষ্ট আছে? আজ প্রাচীরের পর প্রাচীর তুলেছি মানুষের প্রতি আত্মীয়তাকে অবরুদ্ধ করে, আজ দেবতার মন্দিরের দ্বারে পাহারা বসিয়েছি দেবতার অধিকারকেও কৃপনের মতো ঠেকিয়ে রেখে। দানের দ্বারা, ব্যয়ের দ্বারা, যে ধনের অপচয় হয় তাকে বাঁচাতে পারলুম না; কেবল দানের দ্বারা যার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়, মানুষের প্রতি সেই শ্রদ্ধাকে সাম্প্রদায়িক সিন্ধুকের মধ্যে তালা বন্ধ করে রাখলুম। পুণ্যের ভান্ডার বিষয়ীর ভান্ডারের মতোই আকার ধরল। একদিন যে ভারতবর্ষ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর কাছে আপন মনুষ্যত্ব উজ্জ্বল করে তুলেছিল আজ সে আপন পরিচয়কে সংকুচিত করে এনেছে; মানুষকে অশ্রদ্ধা করেই সে মানুষের অশ্রদ্ধাভাজন হল। আজ মানুষ মানুষের বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে; কেননা মানুষ আজ সত্যভ্রষ্ট, তার মনুষ্যত্ব প্রাচল্ল। তাই আজ সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মানুষের প্রতি মানুষের এত সন্দেহ, এত আতঙ্ক, এত আক্রোশ। তাই আজ মহামানবকে এই বলে ডাকবার দিন এসেছে: তুমি আপনার প্রকাশের দ্বারা মানুষকে প্রকাশ করো।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। কিছুদিন পূর্বেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ হয়ে গেল। এক পক্ষের জয় হল, সে জয় বাহুবলের।

কিন্তু যেহেতু বাহুবল মানুষের চরম বল নয়, এইজন্যে মানুষের ইতিহাসে সে জয় নিষ্ফল হল, সে জয় নূতন যুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে। মানুষের শক্তি অক্রোধে, ক্ষমাতে, এই কথা বুঝাতে দেয় না সেই পশু যে আজও মানুষের মধ্যে মরেনি। তাই মানবের সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা করে মানবের গুরু বলেছেন: ক্রোধকে জয় করবে অক্রোধের দ্বারা, নিজের ক্রোধকে এবং অন্যের ক্রোধকে। এ না হলে মানুষ ব্যর্থ হবে, যেহেতু সে মানুষ। বাহুবলের সাহায্যে ক্রোধকে প্রতিহিংসাকে জয়ী করার দ্বারা শান্তি মেলে না, ক্ষমাই আনে শান্তি, এ কথা মানুষ আপন রাষ্ট্রনীতিতে সমাজনীতিতে যতদিন স্বীকার করতে না পারবে ততদিন অপরাধীর অপরাধ বেড়ে চলবে; রাষ্ট্রগত বিরোধের আগুন কিছুতে নিভবে না; জেলখানার দানবিক নিষ্ঠুরতায় এবং সৈন্যনিবাসের সশস্ত্র ভ্রুকুটিবিক্ষেপে পৃথিবীর মর্মান্তিক পীড়া উত্তরোত্তর দুঃসহ হতে থাকবে—কোথাও এর শেষ পাওয়া যাবে না। পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন ‘অক্রোধেন জিনে কোধং’, আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এল: বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি নঙর্থক নয়, সদর্থক; যে মুক্তি কর্মত্যাগে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে, যে মুক্তি রাগদ্বৈষবর্জনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীসাধনায়। আজ স্বার্থক্ষুধাঙ্ক বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম রুদ্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা : ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২



ব্রহ্মবিহার

ব্রহ্মবিহারে এই সাধনার পথে বুদ্ধদেব মানুষকে প্রবর্তিত করবার জন্য বিশেষরূপে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি জানতেন কোনো পাবার যোগ্য জিনিস ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যায় না, সেইজন্যে তিনি বেশি কথা না বলে একেবারে ভিত খোঁড়া থেকে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন শীল গ্রহণ করাই মুক্তিপথের পাথেয় গ্রহণ করা। চরিত্র শব্দের অর্থই এই যাতে করে চলা যায়। শীলের দ্বারা সেই চরিত্র গ'ড়ে ওঠে; শীল আমাদের চলবার সম্বল।

পাণং ন হানে : প্রাণীকে হত্যা করবে না -এই কথাটি শীল। ন চাদিন্নমাদিয়ে : যা তোমাকে দেওয়া হয় নি তা নেবে না -এই একটি শীল। মুসা ন ভাসে : মিথ্যা কথা বলবে না -এই একটি শীল। ন চ মজ্জপো সিয়া : মদ খাবে না -এই একটি শীল। এমনি করে যথাসাধ্য একটি একটি করে শীল সঞ্চয় করতে হবে।

আর্যশ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন : ইধ অরিয়সাবকো অন্তনো সীলানি অনুস্সরতি।

শীল সকলকে কী বলে অনুসরণ করেন?

অখণ্ডানি, অচ্ছিদানি, অসবলানি, অকস্মাসানি, ভুজিস্সানি, বিঞ্ঞপসথানি, অপরামট্ঠানি, সমাধিসংবত্তনিকানি। অর্থাৎ, আমার এই শীল খণ্ডিত হয় নি, এতে ছিদ্র হয় নি, আমার এই শীল জোর করে রক্ষিত হয় নি, অর্থাৎ ইচ্ছা করেই রাখছি, এই শীলে পাপ স্পর্শ করে নি, এই শীল ধন মান প্রভৃতি কোনো স্বার্থসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই শীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, এই শীল বিদলিত হয় নি এবং এই শীল মুক্তিপ্রবর্তন করবে। এই বলে আর্যশ্রাবকগণ নিজ নিজ শীলের গুণ বারম্বার স্মরণ করেন।

বুদ্ধদেব

এই শীলগুলিই হচ্ছে মঙ্গল । মঙ্গললাভই প্রেম ও মুক্তিলাভের সোপান । বুদ্ধদেব কাকে যে মঙ্গল বলেছেন তা মঙ্গলসূত্রে কথিত আছে । সেটি অনুবাদ করে দিই—

বহু দেবা মনুসসা চ মঙ্গলানি অচিস্তয়ুং
আকঙ্খমানা সোথানং ব্রুহি মঙ্গলমুত্তমং ।

বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে, ‘বহু দেবতা বহু মানুষ যাঁরা শুভ আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁরা মঙ্গলের চিন্তা করে এসেছেন, সেই মঙ্গলটি কী বলো ।’
বুদ্ধ উত্তর দিচ্ছেন—

অসেবনা চ বালানং পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা
পূজা চ পূজনেয়্যানং এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
অসৎগণের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা করা, পূজনীয়কে পূজা করা
— এই হচ্ছে উত্তম মঙ্গল ।

পতিরূপদেসবাসো পুরো চ কতপুঞ্ঞতা
অন্তসম্মাপণিধি চ এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
যে দেশে ধর্মসাধন বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্বকৃত পুণ্যকে বর্ধিত করা, আপনাকে সৎকর্মে প্রণিধান করা —এই উত্তম মঙ্গল ।

বহুসথঞ্চ সিপ্পঞ্চ বিনয়ো চ সুসিদ্ধিতো
সুভাসিতা চ যা বাচা এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
বহু-শাস্ত্র-অধ্যয়ন, বহু-শিল্প-শিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা —এই উত্তম মঙ্গল ।

মাতাপিতু-উপট্ঠানং পুত্তদারস্স সংগহো ।
অনাকুলা চ কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
মাতাপিতাকে পূজা করা, স্ত্রীপুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা —এই উত্তম মঙ্গল ।

দানঞ্চ ধম্মচরিয়ঞ্চ ঞ্জাতকানঞ্চ সংগহো
অনবজ্জানি কম্মানি এতং মঙ্গলমুত্তমং ।
দান, ধর্মচর্যা, জ্ঞাতবর্গের উপকার, অনিন্দনীয় কর্ম —এই উত্তম মঙ্গল ।

বুদ্ধদেব

আরতী বিরতি পাপা মজ্জপানা চ সঞঃঞমো

অপ্পমাদো চ ধম্মেসু এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

পাপে অনাসক্তি এবং বিরতি, মদ্যপানে বিতৃষ্ণা, ধর্মকর্মে অপ্রমাদ -এই উত্তম মঙ্গল ।

গারবো চ নিবাতো চ সম্বট্ঠী চ কতঞঃঞুতা

কালেন ধম্মসবনং এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

গৌরব অথচ নম্রতা, সম্ভটি, কৃতজ্ঞতা, যথাকালে ধর্মকথাশ্রবণ -এই উত্তম মঙ্গল ।

খত্তী চ সোবচস্সতা সমণাঞ্চ দস্সনং

কালেন ধম্মসাকচ্ছা এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্মালোচনা -এই উত্তম মঙ্গল ।

তপো চ ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ অরিয়সচ্চান দস্সনং

নিব্বানসচ্ছিকিরিয়া এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মুক্তিলাভের উপযুক্ত সংকার্য -এই উত্তম মঙ্গল ।

ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি চিত্তং যস্স ন কম্পতি

অসোকং বিরজং থেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

লাভ ক্ষতি নিন্দা প্রশংসা প্রভৃতি লোকধর্মের দ্বারা আঘাত পেলেও যার চিত্ত কম্পিত হয় না, যার শোক নেই, মলিনতা নেই, যার ভয় নেই - সে উত্তম মঙ্গল পেয়েছে ।

এতাদিসানি কত্ত্বান সৰ্ব্বথমপরাজিতা

সৰ্ব্বথ সোথি গচ্ছন্তি তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি ।

এইরকম যারা করেছে তারা সর্বত্র অপরাজিত, তারা সর্বত্র স্বস্তি লাভ করে, তাদের উত্তম মঙ্গল হয় ।

যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম তারা ঠিক কথা বলে না । মঙ্গল একটা উপায় মাত্র । তবে নির্বাণই চরম? তা হতে পারে, কিন্তু সেই নির্বাণটি কী? সে কি শূন্যতা?

বুদ্ধদেব

যদি শূন্যতাই হত তবে পূর্ণতার দ্বারা তাতে গিয়ে পৌছনো যেত না। তবে কেবলই সমস্তকে অস্বীকার করতে করতে, ‘নয় নয় নয়’ বলতে বলতে, একটার পর একটা ত্যাগ করতে করতেই, সেই সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাণ লাভ করা যেত।

কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সে পথের ঠিক উলটা পথ দেখি যে। তাতে কেবল তো মঙ্গল দেখছি নে, মঙ্গলের চেয়েও বড়ো জিনিসটি দেখছি যে।

মঙ্গলের মধ্যেও একটা প্রয়োজনের ভাব আছে। অর্থাৎ, তাতে একটা কোনো ভালো উদ্দেশ্য সাধন করে, কোনো-একটা সুখ হয় বা সুযোগ হয়।

কিন্তু, প্রেম যে সকল প্রয়োজনের বাড়া। কারণ, প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা; সে কিছু নেওয়ার অপেক্ষা করে না, সে যে কেবলই দেওয়া। যে দেওয়ার মধ্যে কোনো নেওয়ার সম্বন্ধ নেই সেইটেই হচ্ছে শেষের কথা, সেইটেই ব্রহ্মের স্বরূপ –তিনি নেন না।

এই প্রেমের ভাবে, এই আদান বিহীন প্রদানের ভাবে আত্মাকে ক্রমশ পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্যে বুদ্ধদেবের উপদেশ আছে, তিনি তার সাধনপ্রণালীও বলে দিয়েছেন। এ তো বাসনা সংহরণের প্রণালী নয়, এ তো বিশ্ব হতে বিমুক্ত হবার প্রণালী নয়, এ যে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম ‘মৈত্রীভাবনা’ –মৈত্রীভাবনা।

প্রতিদিন এই কথা ভাবতে হবে : সর্বের সত্তা সুখিতা হোন্ত, অবেরা হোন্ত, অব্যাপজ্জ্বা হোন্ত, সুখী অন্তানং পরিহরন্ত, সর্বের সত্তা মা যথালদ্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্ত।

সকল প্রাণী সুখী হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কাল হরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালদ্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক।

মনে ক্রোধ ঘৃণা লোভ ঈর্ষা থাকলে এই মৈত্রীভাবনা সত্য হয় না, এইজন্য শীলগ্রহণ শীলসাধন প্রয়োজন। কিন্তু শীল সাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্বত্র মৈত্রীকে দয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার। এই উপায়েই আত্মাকে সকলের

বুদ্ধদেব

মধ্যে উপলদ্ধি করা সম্ভব হয় ।

এই মৈত্রীভাবনার দ্বারা আত্মাকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করা, এ তো শূন্যতার পন্থা নয় ।

তা যে নয় তা বুদ্ধ যাকে ব্রহ্মবিহার বলছেন তা অনুশীলন করলেই বোঝা যাবে ।

করণীয় মথ কুসলেন

যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ

সক্কো উজ্জু চ সুহজ্জু চ

সুবচো চস্স মৃদু অনতিমানী ।

শান্তপদ লাভ করে পরমার্থকুশল ব্যক্তির যা করণীয় তা এই – তিনি শক্তিমান, সরল, অতি সরল, সুভাষী, মৃদু, নম্র এবং অনভিমানী হবেন ।

সম্বসসকো চ সুভরো চ,

অপ্পকিচ্ছো চ সল্লঙ্কবুত্তি

সত্তিন্দ্ৰিয়ো চ নিপকো চ

অপ্পগব্ভো কুলেসু অননুগিচ্ছো ।

তিনি সম্ভট্টহৃদয় হবেন, অশ্লোই তার ভরণ হবে; তিনি নিরুদ্ধবেগ, অশ্লভোজী, শান্তেন্দ্রিয়, সদ্বিবেচক, অপ্রগল্ভ এবং সংসারে অনাসক্ত হবেন ।

ন চ খুদ্ধং সমাচরে কিঞ্চি

যেন বিঞ্ঞপরে উপবদেয়্যুং ।

সুখিনো বা থেমিনো বা

সব্বে সত্তা ভবন্ত সুখিতত্তা ।

এমন ক্ষুদ্র অন্যায়ও কিছু আচরণ করবেন না যার জন্যে অন্যে তাঁকে নিন্দা করতে পারে । তিনি কামনা করবেন সকল প্রাণী সুখী হোক, নিরাপদ হোক, সুস্থ হোক ।

যে কেচি পাণভূতখি

তসা বা থাবরা বা অনবসেসা ।

দীঘা বা যে মহত্তা বা

বুদ্ধদেব

মজ্জিমা রসসকা অণুকথুলা ।

দিট্ঠা বা যে চ অদিট্ঠা

যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে ।

ভূতা বা সম্ভবেসী বা

সব্বে সত্তা ভবন্ত সুখিতত্তা ।

যে কোনো প্রাণী আছে, কী সবল কী দুর্বল, কী দীর্ঘ কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম কী
হ্রস্ব, কী সূক্ষ্ম কী স্থূল, কী দৃষ্ট কী অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করছে বা যারা
নিকটে, যারা জন্মেছে বা যারা জন্মাবে, অনবশেষে সকলেই সুখী-আত্মা
হোক ।

ন পরোপরং নিকুৰ্বেথ

নাতিমএৎএৎথ কথচি ন কঞ্চি

ব্যারোসনা পটিঘ সএৎএগা

নএৎএগ মএৎএগস্ স দুক্খমিচ্ছেয়া ।

পরস্পরকে বঞ্চনা কোরো না, কোথাও কাউকে অবজ্ঞা কোরো না, কায়ে
বাক্যে বা মনে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা কোরো না ।

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং

আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে

এবম্পি সৰ্বভূতেসু

মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ।

মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে
সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে ।

মেত্তঞ্চ সৰ্বলোম্মিৎ

মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং ।

উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ

অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ।

উর্ধ্বে আধোতে চার দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন
অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে ।

বুদ্ধদেব

তিট্ঠং চরং নিসিন্নো বা
সয়ানো বা যাবতস্‌স বিগতমিদ্ধো
এতং সতিং অধিট্ঠেয়্যং
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাছ।

যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত, এইপ্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।

অপরিমিত মানসকে প্রীতিভাবে মৈত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে ব্রহ্মবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্য প্রীতি নয়-মা তাঁর একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম ভালোবাসেন সেইরকম ভালোবাসা।

ব্রহ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে, এক পুত্রের প্রতি মাতার যে প্রেম সেই প্রেম যে তাঁর সর্বত্র। তাঁরই সেই মানসের সঙ্গে মানস, প্রেমের সঙ্গে প্রেম না মেশালে সে তো ব্রহ্মবিহার হল না।

কথাটা খুব বড়ো। কিন্তু, বড়ো কথাই যে হচ্ছে, বড়ো কথাকে ছোটো কথা করে তো লাভ নেই। ব্রহ্মকে চাওয়াই যে সকলের চেয়ে বড়োকে চাওয়া। উপনিষৎ বলেছেন : ভূমাত্বের বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। ভূমাকেই, সকলের চেয়ে বড়োকেই, জানতে চাইবে।

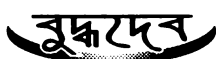
সেই চাওয়া সেই পাওয়ার রূপটা কী সে তো স্পষ্ট করে, পরিস্কার করে সম্মুখে ধরতে হবে। ভগবান বুদ্ধ ব্রহ্ম-বিহারকে সুস্পষ্ট করে ধরেছেন; তাকে ছোটো করে, ঝাপসা করে, সকলের কাছে চলনসই করবার চেষ্টা করেননি। অপরিমিত মানসে অপরিমিত মৈত্রীকে সর্বত্র প্রসারিত করে দিলে ব্রহ্মের বিহারক্ষেত্রে ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন হয়।

এই তো হল লক্ষ্য। কিন্তু, এ তো আমরা একেবারে পারব না। এই দিকে আমাদের প্রত্যহ চলতে হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে তুলনা করে প্রত্যহ বুঝতে পারব আমরা কতদূর অগ্রসর হলুম।

ঈশ্বরের প্রতি আমার প্রেম জন্মাচ্ছে কি না সে সম্বন্ধে আমরা নিজেকে নিজে ভোলাতে পারি। কিন্তু সকলের প্রতি আমার প্রেম বিস্তৃত হচ্ছে কি না, আমার

শক্তি ক্ষয় হচ্ছে কি না, আমার মঙ্গলভাব বাড়ছে কি না তার পরিমাণ স্থির করা শক্ত নয়।

একটা-কোনো নির্দিষ্ট সাধনা সুস্পষ্ট পথ পাবার জন্যে মানুষের একটা ব্যাকুলতা আছে। বুদ্ধদেব এক দিকে উদ্দেশ্যকে যেমন খর্ব করেন নি তেমনি তিনি পথকেও খুব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কেমন করে ভাবতে হবে এবং কেমন করে চলতে হবে তা তিনি খুব স্পষ্ট করে বলেছেন। প্রত্যহ শীলসাধনার দ্বারা তিনি আত্মাকে মোহ থেকে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন এবং মৈত্রী ভাবনা-দ্বারা আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পথ দেখিয়েছেন। প্রতিদিন এই কথা স্মরণ করো যে, আমার শীল অখণ্ড আছে, অচ্ছিন্ন আছে এবং প্রতিদিন চিন্তকে এই ভাবনায় নিবিষ্ট করো যে, ক্রমশ সকল বিরোধ কেটে গিয়ে আমার আত্মা সর্বভূতে প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ, এক দিকে বাধা কাটছে আর-এক দিকে স্বরূপলাভ হচ্ছে। এই পদ্ধতিকে তো কোনোক্রমেই শূন্যতালাভের পদ্ধতি বলা যায় না। এই তো নিখিললাভের পদ্ধতি, এই তো আত্মালাভের পদ্ধতি, পরমাত্মালাভের পদ্ধতি।



বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ

ডাক্তার রিচার্ড দীর্ঘকাল চীনদেশে বাস করিতেছেন। তিনি খৃষ্টান মিশনরি। তিনি লিখিতেছেন, একবার তিনি কার্যবশত ন্যান্‌কিং শহরে গিয়াছিলেন। সেখানে একটি বৌদ্ধশাস্ত্র প্রকাশ-সভা আছে। টাইপিং বিপ্লবের সময় যে-সকল গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে তাহাই পুনরুদ্ধার করা এই সভার উদ্দেশ্য।

এই সভার প্রধান উদ্যোগী যিনি তাঁহার নাম য়াঙ্ বেন্ হুই। তিনি চীনের রাজপ্রতিনিধির অনুচররূপে দীর্ঘকাল যুরোপে যাপন করিয়াছেন। কনফুসীয় শাস্ত্র-শিক্ষায় তিনি উচ্চ উপাধি-ধারী।

ডাক্তার রিচার্ড তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করিলেন ‘আপনি কনফুসীয় উপাধি লইয়া কী করিয়া বৌদ্ধ হইলেন’, তিনি উত্তর করিলেন, ‘আপনি ‘মিশনরি’ হইয়া আমাকে এমন প্রশ্ন করিলেন, ইহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি। আপনি তো জানেন, কেবলমাত্র সাংসারিক ব্যাপারের প্রতিই কনফুসীয় ধর্মের লক্ষ্য—যাহা সংসারে অতীত তাহার প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই।’ রিচার্ড সাহেব কহিলেন, ‘যাহা সংসারের অতিবর্তী, তাহার সম্বন্ধে মানবমনের যে প্রশ্ন, বৌদ্ধধর্মে তাহার কি কোনো সত্য মীমাংসা আছে?’ তিনি কহিলেন, ‘হ্যাঁ।’ পাদ্রিসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কোথায় তাহা পাওয়া যায়?’ বেন্ হুই উত্তর করিলেন, ‘ভক্তি-উদ্‌বোধন-নামক একটি গ্রন্থে পাইবেন। এই পুস্তক পড়িয়াই কনফুসীয় ধর্ম ছাড়িয়া আমি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছি।’

ডাক্তার রিচার্ড এই বই আনাইলেন। পড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি বই ছাড়িতে পারিলেন না। আর একজন মিশনরি রাত্রি জাগিয়া তাঁহার পাশে কাজ করিতেছিলেন; তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘এ আমি আশ্চর্য একটি খৃষ্টান বই পড়িতেছি।’

ডাক্তার রিচার্ড যে বইটির কথা বলিয়াছেন তাহার মূল গ্রন্থটি সংস্কৃত,

অশ্বঘোষের রচনা। এই সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে; কেবল চীন ভাষায় ইহার অনুবাদ এখন বর্তমান আছে।^১

বৌদ্ধধর্ম জিনিসটা কী সে সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করিয়া লইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস এই যে, এই ধর্মে ধর্মের আর-সমস্ত অঙ্গই আছে, কেবল ইহার মধ্যে ঈশ্বরের কোনো স্থান নাই। জ্ঞানে

১ ‘শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র’ বা ‘মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র’। এই গ্রন্থের মূল সংস্কৃত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ইহার ইংরেজী অনুবাদ Asvaghosha's Discourse on the Awakening of Faith in the Mahayana, translated for the first time from the Chinese version by Teitaro Suzuki, Chicago, 1900.

পাদটীকা শান্তিনিকেতন চীন-ভবনের শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে।

ইহার ভিত্তি এবং কর্মে ইহার মন্দিরটি গড়া। কিন্তু মন্দিরের মধ্যে কেহ নাই; সেখানে নির্বাণের অঙ্ককার, ভক্তি সেখান হইতে নির্বাসিত।

আমরা তো বৌদ্ধধর্মকে এইভাবে দেখি, অথচ দেখিতে পাইতেছি—বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে খৃষ্টান এমন-কিছু লাভ করিতেছেন যাহার সঙ্গে তিনি আপন ধর্মের প্রভেদ দেখিতেছেন না এবং যাহার রসে আকৃষ্ট হইয়া কনফুসীয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার প্রচারে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন।

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন, ‘হাঁ, চারিত্রনীতির উপদেশে খৃষ্টান-ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিল আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করে।’ কিন্তু একটি কথা মনে রাখা উচিত, চারিত্রনীতির উপদেশ জিনিসটা মনোরম নহে; তাহা ঔষধ, তাহা খাদ্য নহে; তাহার সাড়া পাইলে ছুটিয়া লোক জড়ো হয় না, বরঞ্চ উলটাই হয়। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যদি এমন কিছু থাকে যাহা আমাদের হৃদয়কে টানে এবং পরিতৃপ্ত করে, তবে জানিব, তাহার মর্মটি, তাহার ধর্মটি সেই জায়গাতেই আছে।

বুদ্ধদেব

ডাক্তার রিচার্ড অশ্বঘোষের গ্রন্থটির মধ্যে এমন-কিছু দেখিয়া-ছিলেন যাহা নীতি-উপদেশের অপেক্ষা গভীরতর, পূর্ণতর; যাহা দার্শনিক তত্ত্ব নহে, যাহা আচার-অনুষ্ঠানের পদ্ধতিমাত্র নহে। সেই জিনিসটি কোথা হইতে আসিল?

সম্প্রতি ইংল্যান্ডে কোনো সভায় কয়েকজন ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি আপন আপন ধর্ম লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। একজন জাপানী বক্তা তাঁহার দেশের বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্যের ধর্মোপদেশ হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই বৌদ্ধ আচার্যের নাম সোয়েন শাকু, ইনি কামাকুরার এঙ্গাকুজি এবং কেক্কোজি মঠের অধ্যক্ষ। ইনি এক স্থানে বলিয়াছেন—

‘আমরা বস্তুমাত্রের সীমাবদ্ধ বিশেষ সত্তা মানিয়া থাকি। সকল বস্তুই দেশে কালে বদ্ধ হইয়া কার্যকারণের নিয়মে চালিত হয়। বিষয়রাজ্যের বহুত্ব আমরা স্বীকার করি। এই সংসার বাস্তব, ইহা শূন্য নহে; এই জীবন সত্য, ইহা স্বপ্ন নহে। আমরা বৌদ্ধরা একটি আদিকারণ মানি যাহা সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ও সর্বপ্রেমী। এই জগৎ সেই মহাপ্রজ্ঞা মহাপ্রাণের প্রকাশ। ইহার সকল বস্তুতেই সেই আদিকারণের প্রকৃতির অংশ আছে। কেবল মনুষ্য নহে, পশু ও জড় বস্তুতেও আদিকারণের দিব্য স্বভাব প্রকাশমান হইতেছে

‘ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, আমাদের মতে একই বহু এবং বহুই এক। এই জীবন এবং জগতের বাহিরে জগতের কারণকে খুঁজিতে যাওয়া ভ্রম। তাহা আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত। কিন্তু তাই বলিয়া এই জগতের মধ্যেই তাহার শেষ নহে, জগতের সমস্ত পদার্থসমষ্টিকে অতিক্রম করিয়াও সে আছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে যে, এই বিষয়রাজ্য অসত্য নহে, ইহার মূল কারণ জ্ঞানস্বরূপ এবং তাহা সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত।

উপরে যাহা উদ্ধৃত করা গেল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সাধারণত আমাদের যে ধারণা তাহার সহিত এই বৌদ্ধাচার্যের মতের মিল নাই। সম্ভবত কোনো কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতের সঙ্গেও ইহার অনৈক্য হইবে।

বুদ্ধদেব

কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, কোনো কোনো বৌদ্ধসমাজে বৌদ্ধধর্ম এইরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং নামান্তর গ্রহণ না করিয়া ইহা বৌদ্ধধর্ম বলিয়াই পরিচিত। ইতিহাসের কোনো-একটা বিশেষ স্থানে যাহা থামিয়া গিয়াছে তাহাকেই বৌদ্ধধর্ম বলিব— আর, যাহা মানুষের জীবনের মধ্যে নব নব কালে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, নব নব খাদ্যকে আত্মসাৎ করিয়া আপন জীবনকে পরিপুষ্ট প্রশস্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহাকে বৌদ্ধধর্ম বলিব না—এই যদি পণ করিয়া বসি তবে কোনো জীবিত ধর্মকে ধর্ম নাম দেওয়া চলে না।

কোনো বৃহৎ ধর্মই একটিমাত্র সরল সূত্র নহে, তাহাতে নানা সূত্র জড়াইয়া আছে। সেই ধর্মকে যাহারা আশ্রয় করে তাহারা আপনার প্রকৃতির বিশেষত্ব-অনুসারে তাহার কোনো একটা সূত্রকে বিশেষ করিয়া বা বেশি করিয়া বাছিয়া লয়। খৃষ্টান-ধর্মে রোমান ক্যাথলিকদের সঙ্গে ক্যালভিন-পন্থীদের অনেক প্রভেদ আছে। দুই ধর্মের মূল এক জায়গায় থাকিলেও তাহার পরিণতিতে গুরুতর পার্থক্য ঘটিয়াছে। আমরা যদি কেবলমাত্র ক্যালভিন-পন্থীদের মত হইতে খৃষ্টান-ধর্মকে বিচার করি, তবে নিশ্চয়ই তাহা অসম্পূর্ণ হইবে।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। সকলেই জানেন এই ধর্ম হীনযান এবং মহাযান এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই দুই শাখার মধ্যে প্রভেদ গুরুতর। আমরা সাধারণত হীনযানমতাবলম্বী বৌদ্ধদের ধর্মকেই বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম বলিয়া গণ্য করিয়া লইয়াছি।

তাহার একটা কারণ মহাযান-সম্প্রদায়ী বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষে আমরা দেখিতে পাই না। দ্বিতীয় কারণ, যে পালি-সাহিত্য অবলম্বন করিয়া যুরোপীয় পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাহার মধ্যে মহাযান সম্প্রদায়ের মতগুলি পরিণত আকার ধারণ করে নাই।

ধর্মকে চিনিতে গেলে তাহাকে জীবনের মধ্যে দেখিতে হয়। পুরাতত্ত্ব-আলোচনার দ্বারা তাহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেক সময় মিশনারীরা যখন আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে বিচার করেন, তখন দেখিতে পাই, তাঁহারা কেবলমাত্র

বই পড়িয়া বা সাময়িক বিকৃতির প্রতি লক্ষ করিয়া বিদেশীর ধর্ম সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা নিতান্তই অঙ্গহীন। বস্তুত শাস্ত্রবচন খুঁটিয়া লইয়া, টুকরা জোড়া দিয়া, ধর্মকে চেনা যায় না। তাহার একটি সমগ্র ভাব আছে। সেই ভাবটিকে ঠিকমত ধরা শক্ত এবং ধরিলেও তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া নির্দেশ করা সহজ নহে।

আমাদের দেশে যাঁহারা খৃস্টান-ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহাদের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, খৃস্টানদের মুখ হইতেই তাঁহারা খৃস্টান-ধর্মের কথা শুনিতে পান, এইজন্য তাহার ভিতরকার সুরটা তাঁহাদের কানে গিয়া পৌঁছায়। যদি কেবল প্রাচীন শাস্ত্র পড়িয়া, বচন জোড়া দিয়া, তাঁহাদিগকে এই কাজটি করিতে হইত তবে অন্ধ যেমন হাত বুলাইয়া রূপ নির্ণয় করে তাঁহাদেরও সেই দশা ঘটিত। অর্থাৎ, মোটামুটি একটা আকৃতির ধারণা হইত, কিন্তু সেই ধারণাটাই সর্বোচ্চ ধারণা নহে। রূপের সঙ্গে যে বর্ণ, যে লাবণ্য, যে-সকল অনিবচনীয় প্রকাশ আছে, তাহা তাঁহাকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া যাইত।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আমাদের সেই দশা ঘটিয়াছে। পুঁথি-পড়া বিদেশী পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের গ্রন্থের শুষ্কপত্র হইতে আমরা এই ধর্মের পরিচয় গ্রহণ করি। এই ধর্মের রসধারায় সেই পণ্ডিতদের চিত্ত স্তরে স্তরে অভিষিক্ত নহে। এক প্রদীপের শিখা হইতে আর এক প্রদীপ যেমন করিয়া শিখা গ্রহণ করে তেমন করিয়া তাঁহারা এই ধর্মকে সমগ্রভাবে লাভ করেন নাই। এমন অবস্থায় তাঁহাদের কাছ হইতে আমরা যাহা পাই তাহা নিতান্ত মোটা জিনিস; তাহা আলোকহীন, চক্ষুহীন, স্পর্শগত অনুভব মাত্র।

এইজন্য এইরূপ শাস্ত্র-গড়া বৌদ্ধধর্ম হইতে আমরা এমন জিনিস পাই না যাহা আমাদের অন্তঃকরণের গভীর ক্ষুধার খাদ্য জোগাইতে পারে। একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি অনেক কাল পালি গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখের কথার আভাসে একদিন বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি এই আলোচনায় রস পান নাই, তাঁহার সময় মিথ্যা কাটিয়াছে।

বুদ্ধদেব

অথচ এই ধর্ম হইতে কেহ রস পায় নাই এমন কথা বলিতে পারি না। ইহার মধ্যে একটি গভীর রসের প্রস্রবণ আছে যাহা ভক্তচিন্তকে আনন্দে মগ্ন করিয়াছে। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করিয়া যে ভক্তির বন্যা দেশকে প্লাবিত করিয়াছিল তাহার সঙ্গে আমাদের দেশে বৈষ্ণব ধর্মের আন্দোলনের বিশেষ প্রভেদ দেখি না।

আমাদের দেশে এক বেদান্তসূত্রকে অবলম্বন করিয়া দুই বিপরীত মতবাদ দেখা দিয়াছে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ আর বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ। শঙ্করের অদ্বৈতবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া কেহ কেহ নিন্দা করিয়াছেন। ইহা হইতে অন্তত এ কথা বুঝা যায় যে, বৌদ্ধদর্শনের সংঘাতে এবং অনেক পরিমাণে তাহার সহায়তায় শঙ্করের এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু সেই দ্রাবিড় হইতেই যে প্রেমের ধর্মের স্রোত সমস্ত ভারতবর্ষে একদিন ব্যাপ্ত হইয়াছে সেই বৈষ্ণব-ধর্মকেও কি এই বৌদ্ধধর্মই সঞ্জীবিত করিয়া তোলে নাই? আমরা দেখিয়াছি বৌদ্ধ মন্দিরে বৈষ্ণব দেবতা স্থান লইয়াছে, এককালে যাহা বুদ্ধের পদচিহ্ন বলিয়া পূজিত হইত তাহাই বিষ্ণুপদচিহ্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছে, রথযাত্রা প্রভৃতি বৌদ্ধ উৎসবকে বৈষ্ণব আত্মসাৎ করিয়াছে।

বৌদ্ধযুগের পূর্বে আমরা যে বৈদিক দেবতাদিগকে দেখি তাঁহারা স্বর্গবাসী, দিব্যপুরুষ। সংসারপাশে আবদ্ধ মানুষকে মুক্তিদান করিবার জন্য পরমদয়া যে মানবরূপে মর্তলোকে আবির্ভূত - এই ভাবটির উদ্ভব কি সর্বপ্রথমে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেই নহে? বৈদিক যুগে কি কোথাও আমরা ইহার কোনো আভাস পাইয়াছি?

জাপানী অধ্যাপক আনেসাকি 'হিবার্ট জর্নালে' খৃস্টান ও বৌদ্ধ-ধর্মের তুলনা করিয়া এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে, এই দুই ধর্মধারার মূলে আমরা একটি জিনিস দেখিতে পাই - উভয় স্থানেই সত্য মানবরূপ গ্রহণ করিয়াছে, ভক্তি নরদেহ ধারণ করিয়াছে, প্রেমেতে এবং ভক্তিতে সত্যকে সম্মিলিত করিয়া উপলব্ধি করিবার জন্য বিশ্বমানবের প্রতিনিধিস্বরূপ একজন মানুষের প্রয়োজন

হইয়াছে ।

বস্তুত বৌদ্ধধর্মেই সর্বপ্রথমে কোনো-একজন মানুষকে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি করিয়া দেখা হইয়াছিল । বৌদ্ধধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি তাঁহার ভক্তদের চক্ষে মানুষের সমস্ত স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করিয়াই যেন প্রতিভাত হইয়াছেন । তিনি যে অসামান্য শক্তিসম্পন্ন গুরু তাহা নহে— তিনি যেন মূর্তিমান অসীমপ্রজ্ঞা, অসীমকরুণা । তিনি মুক্ত হইয়াও কেবল জীবকে দুঃখ হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই বন্ধন স্বীকার করিয়াছেন— সে তাঁহার কর্মফলের অনিবার্য বন্ধন নহে; সে তাঁহার প্রেমের দ্বারা, দয়ার দ্বারা স্বেচ্ছাচরিত বন্ধন ।

কোনো বিশেষ একজন মানুষকে এমন করিয়া অসীম করিয়া দেখা বৌদ্ধধর্মে প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং যিশুকে ত্রাণকর্তা অবতাররূপে স্বীকার করা যে এই বৌদ্ধ মতেরই অনুসরণ করিয়া ঘটে নাই তাহা বলিতে পারিব না । বৌদ্ধধর্মের এই অবতারবাদ, এই ভক্তিবাদের দিকটাই বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতে বৌদ্ধধর্মের পরিণামরূপে বিরাজ করিতেছে এইরূপ আমার বিশ্বাস ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সাধু হোনের জাপানে বৌদ্ধধর্মের মধ্য হইতে যে ভক্তি উৎস উৎসারিত করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ অধ্যাপক আনেসাকি ধর্ম-ইতিহাস-আলোচনার আন্তর্জাতিক সম্মিলনসভায় বিবৃত করিয়াছিলেন । ভাগবত ধর্মের সঙ্গে তাঁহার সে ভক্তিধর্মের মর্মগত প্রভেদ নাই বলিলেই হয় । তিনি বলিয়াছেন, অমিত বুদ্ধের দয়াতেই জীবের মুক্তি । এই অমিত সুখাবতী নামক বৌদ্ধশাস্ত্রের আনন্দলোকের অধীশ্বর । ইনি সর্বশক্তিমান, করুণাময়, মুক্তিদাতা । যে-কেহ ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার শরণ গ্রহণ করিবে সে বুদ্ধকে মনশ্চক্ষুতে দেখিতে পাইবে ও মৃত্যুকালে সমস্ত পার্শ্বদমণ্ডলী-সহ অমিত আসিয়া তাহাকে আদরে গ্রহণ করিবেন । এই অমিতাভের জ্যোতি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত, দৃষ্টি মেলিলেই দেখা যায়; এই অমিতায়ুর প্রাণ মুক্তিধামে নিত্যকাল উপলব্ধ, যিনি ইচ্ছা করেন লাভ করিতে পারেন ।

ইহা হইতে পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন, বুদ্ধ যেখানেই মানুষের জ্ঞানকে

ছাড়াইয়া তাহার ভক্তিকে অধিকার করিয়াছেন সেখানেই সঙ্গে ভগবানের ধারণা এক হইয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের তিনটি মুখ— বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ। তাহার ধর্মে জ্ঞান, সংঘে কর্ম ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত হইয়া আছে। যদিও এই তিনের পরিপূর্ণ সম্মিলনই বৌদ্ধধর্মের পূর্ণ আদর্শ, তবু দেশ কাল পাত্রের প্রকৃতি-অনুসারে সে আদর্শ বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তখন ইহার কোনো একটা দিকই প্রবল হইয়া দেখা দেয়। হীনযান ও মহাযানে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। হীনযানের দিকে যখন দেখি তখন মনে হয় বৌদ্ধধর্মে পূজাভক্তি বুঝি নাই, প্রত্যক্ষের অতীত কোনো মহৎসত্তাকে বৌদ্ধধর্ম বুঝি একেবারেই অস্বীকার করে— আবার মহাযানের দিকে তাকাইলে মনে হয় ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বৌদ্ধধর্ম নানা বিচিত্র রূপ রস সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, কোথাও তাহার জ্ঞানের সংযম নাই।

কিন্তু আসল কথা, বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এই দুটা দিকই আছে। সমস্ত বাসনা ও কর্ম নিঃশেষে ধ্বংস করিয়া নির্বাণ মুক্তির মধ্যেই আপনাকে একেবারে ‘না’ করিয়া দেওয়াই যে বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য নহে তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। সর্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটি শূন্য পদার্থ নহে। এমন বিশ্বব্যাপী প্রেমের অনুশাসন কোনো ধর্মেই নাই। প্রেমের দ্বারা সমস্ত সম্বন্ধ সত্য এবং পূর্ণ হয়, কোনো সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। অতএব প্রেমের চরমে যে বিনাশ ইহা কোনোমতেই শ্রদ্ধেয় নহে।

এক দিকে স্বার্থপর বাসনাকে ক্ষয় ও অন্য দিকে স্বার্থত্যাগী প্রেমকে সমস্ত সীমা অবলুপ্ত করিয়া বিস্তার করা এই দুই শিক্ষাই যেখানে প্রবল মাত্রায় একত্র মিলিত হইয়াছে, বুঝিতেই হইবে, শূন্যতাই সেখানে লক্ষ্য নহে। কোনো-এক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদলের বা কোনো বিশেষ বৌদ্ধগ্রন্থের মধ্যে পোষক প্রমাণ থাকিলেও আমরা তাহাকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। মাটি চাষ করাটাকেই মুখ্য বলিয়া গণ্য করিব এবং ফসল বোনাটাকেই গৌণ বলিয়া উপেক্ষা করিব, ইহা হইতেই পারে না।

এই ফসলের কথাটা যেখানে আছে সেইখানেই মানুষের মন বিশেষ করিয়া

বুদ্ধদেব

আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সেই আকর্ষণেই কঠিন সাধনার দুঃখ মানুষ মাথায় করিয়া লইয়াছে । এক-দল তार्কিক এমনভাবে তর্ক করে যে, যেহেতু ক্ষেত্রকে দীর্ঘ বিদীর্ণ করিতে বলা হইয়াছে, অতএব সমস্ত ফসল নষ্ট করিয়া ফেলাই এই উপদেশের তাৎপর্য । আগাছা উৎপাটন করিয়া ফেলাই যে তাহার উদ্দেশ্য সে কথা বুঝিতে বাকি থাকে না যখন শুনিতে পাই ‘প্রেমের বীজ মুঠা মুঠা দিকে দিকে ছড়াইয়া দিবে’ । এই প্রেমের ফসল নির্বাণ নহে, আনন্দ, সে কথা বলাই বাহুল্য ।

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব শূন্যবাদী ছিলেন না ও তিনি ব্রহ্মকে স্বীকার করিয়াছেন । লেখক বলিয়াছেন, ইতিবৃত্তকং-নামক পালি-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক সময়ে ভগবান বুদ্ধ নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

যস্‌স রাগো চ দোসো চ অবিজ্জা চ বিরাজিতা

তম্‌ ভাবিতত্ত্বং তরম্‌ ব্রহ্মভূতম্‌ তথাগতম্‌

বুদ্ধম্‌ বেরভয়াতীতম্‌, আহসব্বপহায়িনন্তি ।

যাঁহার রাগ দ্বেষ এবং অবিদ্য তিরোহিত হইয়াছে তাঁহাকে ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মভূত, তথাগত এবং বৈর ও ভয়াতীত এবং সর্বত্যাগী বুদ্ধ বলা হয় ।

ব্রহ্মভূত শব্দের অর্থ এই যে, যিনি ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করেন ।

মহেশবাবু যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ব্রহ্মভূত ব্যক্তির যে সকল লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ত্যাগমূলক । কিন্তু বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র ত্যাগের ধর্ম নহে । তা যদি হইত তবে তাহার মধ্যে প্রেমের কোনো স্থান থাকিত না ।

বস্তুত বৌদ্ধধর্মের বিশেষত্বই এই যে, এক দিকে তাহার যেমন কঠোর ত্যাগ অন্য দিকে তাহার তেমনি উদার প্রেম । ইহা কেবলমাত্র জ্ঞানের ধর্ম, ধ্যানের ধর্ম নহে । বুদ্ধদেব নিজের জীবনেই তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন । তিনি যখন দীর্ঘকাল তপস্যার পর তপস্যা পরিত্যাগ করিলেন তখন যাহারা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছিল তাহাদের শ্রদ্ধা তিনি হারাইলেন । কারণ, তখনকার বিশ্বাস

বুদ্ধদেব

ছিল এই যে, তপশ্চরণের দ্বারা সমাধিপ্রাপ্তিই ব্রহ্মলাভ, তাহাই চরম সিদ্ধি । কিন্তু যখন বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন তখনি তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন । সে কর্ম বিশুদ্ধ কর্ম, কারণ তাহাতে ভয় লোভ মোহ হিংসা নাই; তাহা স্বার্থবন্ধনের অতীত; তাহা দয়ার কর্ম, প্রেমের কর্ম ।

অতএব যেখানে বাসনার ক্ষয় হয় সেখানে যে কিছুই বাকি থাকে না তাহা নহে । সেখানে সমস্ত আসক্তি ও রিপূর আকর্ষণ দূর হইয়া যায় বলিয়াই দয়া প্রেম আনন্দ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে । সেই পরিপূর্ণতাই ব্রহ্মের স্বরূপ । অতএব যিনি ব্রহ্মভূত হইবেন, ব্রহ্মের স্বরূপে বিরাজ প্রেমের পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে ।

এই জন্যই ব্রহ্মবিহার কাহাকে বলে বুদ্ধ তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

মাতা যথা নিয়ং পুত্রং আয়ুসা একপুত্রমনুরক্থে

এবম্পি সর্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং ।

মেতুঞ্চ সর্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং

উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ।

তিট্ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতসস বিগতমিদ্ধো

এতং সতিং অধিট্ঠেয়্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাছ ।

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন সেইরূপ সকল প্রাণীর অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে । উর্ধ্বদিকে অধোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে । কী দাঁড়াইতে কী চলিতে, কী বসিতে কী শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে এই মৈত্রভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে— ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে ।

এইরূপ বিশ্বব্যাপী প্রেমের মধ্যে চিত্তকে প্রসারিত করাকেই বুদ্ধ ব্রহ্মবিহার বলিয়াছেন । ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, বুদ্ধ ব্রহ্মকে প্রেমস্বরূপ বলিয়াই জানিয়াছেন, ব্রহ্ম তাঁহার কাছে শূন্যতা নহে ।

এই প্রেমকে যদি সর্বব্যাপী পরম সত্য বলিয়া গণ্য করা হয় তবে সংসারকে

বুদ্ধদেব

একেবারে বাদ দিয়া বসিলে চলিবে কেন?

করুণা বলো, প্রেম বলো, আপনাকে লইয়া আপনি থাকিতে পারে না। প্রেমের বিষয়কে বাদ দিয়া প্রেমের সত্যতা নাই।

মহাযান-সম্প্রদায়ীরা এ সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা প্রণিধানের যোগ্য। পরে আমরা তাহা আলোচনা করিব।

যিনি নিজে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী অথচ যিনি আধুনিক কালের পাঠকসমাজের কাছে নিজের মত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারই নিকট হইতে আমরা এ সম্বন্ধে সহায়তা প্রত্যাশা করিতে পারি।

জাপানী বৌদ্ধ পণ্ডিত তাইতারো সুজুকির নিকট হইতে এ বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করিতে পারিব। তিনি অশ্বঘোষের গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন এবং মহাযান বৌদ্ধ মতেরও ব্যাখ্যা করিয়া বই লিখিয়াছেন।

তাঁহার গ্রন্থগুলি আমরা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। কিন্তু তাঁহার পুস্তক অবলম্বন করিয়া ইংরেজী Quest পত্রে সম্পাদক মহাশয় যে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ইহা বুঝা যায় যে, যেমন বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে কেবলমাত্র শঙ্কর-ভাষ্য পড়িলে ভারতে প্রচলিত বেদান্তকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হইল মনে করা যায় না, সেইরূপ পালিগ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যায় এবং যাহা অবলম্বন করিয়া সাধারণত যুরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক দিন ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন, বৌদ্ধধর্মের মর্মগত সত্য-সন্ধানের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট নহে।

এ কথা স্পষ্টই মনে হয়, ভারতবর্ষের চিত্ত হইতে জ্ঞানের ধারা এবং প্রেমের ধারাকে বুদ্ধদেব একত্রে আকর্ষণ করিয়া একদিন মিলাইয়াছিলেন। সেই মিলনের বন্যায় একদিন পৃথিবীর দেশ বিদেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে এত বড়ো মিলনের একটি বিপুল শক্তি ভারতবর্ষ হইতে যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহা নহে। বৌদ্ধযুগের পরবর্তী দর্শনে পুরাণে কোথাও বা নবীনরূপে, কোথাও বা পুরাতনকে নূতন আকার দিয়া, সেই ধারা নানা শাখা-প্রশাখায় নানা নামে আজও প্রবাহিত হইতেছে।

বুদ্ধদেব

আমরা পূর্বে এক স্থানে আভাস দিয়াছি, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব-ধর্মের একটা সম্মিলন ঘটিয়াছিল। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম বৈষ্ণব-ধর্মকে সৃষ্টি করে নাই। তাহার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। গুরুতে দেবতা জ্ঞান করা এবং তাঁহার প্রসাদেই মুক্তি এই কথা স্বীকার করা, আমাদের আধুনিক পৌরাণিক ধর্মে দেখা যায়— আমার বিশ্বাস, এইরূপ গুরুবাদের উৎপত্তি বৌদ্ধধর্ম হইতে। ইহার কারণ এই যে, মানুষের ভক্তিবৃত্তি একটা সত্য পদার্থ, তাহাকে খাদ্য জোগাইতেই হইবে। যে ধর্মের যেমন মতই হউক—না কেন, ভক্তির আশ্রয় কাড়িয়া লইলে ভক্তি যেমন করিয়া হউক আপনার একটা আশ্রয় খাড়া করিয়া লয়। বুদ্ধদেব তাঁহার উপদেশে স্পষ্ট করিয়া ভক্তির কোনো চরম আশ্রয় নির্দেশ করেন নাই। এইজন্য তাঁহার অনুবর্তীদের ভক্তিবৃত্তি তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে এবং ভক্তির স্বাভাবিক চরম গতি যে পরমপুরুষে, বুদ্ধকে তাঁহার সঙ্গেই মিলাইয়া লইয়াছে। এইরূপে বৌদ্ধধর্মে মানুষের ভক্তি অগত্যা মানুষকেই আশ্রয় করিয়াছে এবং সেই-সমস্ত সীমাকে ভেদ করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া, ভগবানের মধ্যে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছে এবং সেই-সমস্ত সীমাকে ভেদ করিয়া, বিদীর্ণ করিয়া, ভগবানের মধ্যে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অশ্বথ গাছ যখন মন্দিরের ভিত্তিতে জন্মায় তখন সেই মন্দিরকে নিজের প্রয়োজন-অনুসারে ভাঙিয়া-চুরিয়া নানাখানা করিয়া ফেলে—কেননা, যেখানে তাহার খাদ্য, যেমন করিয়া হউক, সেখানে তাহাকে শিকড় পাঠাইতে হইবে। বৌদ্ধধর্ম একদা দেবতাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই এই ধর্মে ভক্তি মানুষকে আশ্রয় করিয়াছিল; কিন্তু মানুষের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ খাদ্য নাই, এই কারণে সে বাঁকিয়া-চুরিয়া যেমন করিয়া পারে আপন আশ্রয়কে অতিক্রম করিয়া নিত্য আশ্রয়ের মধ্যে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছে। এমনি করিয়া এইখানে গুরুবাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

মুক্তির পক্ষে আত্মশক্তিই প্রধান এই কথার উপরেই বৌদ্ধধর্মে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। তাহার কারণও ছিল। ভারতবর্ষে যে সময় বুদ্ধের আবির্ভাব সে সময়ে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে এই কথার খুব প্রভাব ছিল। হোমাদি করিয়া দেবতাদিগকে খুশি করিতে পারিলেই

তাহাদের অলৌকিক শক্তি-দ্বারা মানুষ সহজেই সদগতি লাভ করিবে এই প্রকার তখন বিশ্বাস ছিল। ইহারই বিরুদ্ধে বুদ্ধদেবকে বিশেষ করিয়া বলিতে হইয়াছিল, সাধু চিন্তা, সাধু বাক্য, সাধু কর্মের দ্বারাই মুক্তির পথ সুগম হয়। মুক্তি যথার্থ সাধনার দ্বারাই সাধ্য, এখানে অল্পমাত্রও ফাঁকি চলে না।

কিন্তু মানুষ জানে আত্মশক্তিই পর্যাপ্ত নহে। শুধু চোখ দিয়া আমরা দেখি না, বাহিরের আলো নহিলে আমাদের দেখা চলে না। তাহার একটা দিক আছে শক্তির দিক, আর-একটা দিক আছে নির্ভরের দিক। এই দুইয়ের যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, ইহার একটাকেই একান্ত করিয়া দিলে, এমন একটা প্রতিক্রিয়ার বিপ্লব উপস্থিত হয় যে উলটা দিকটা অতিমাত্র প্রবল হইয়া উঠে।

বৌদ্ধধর্ম আত্মশক্তিতে মানুষকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার পক্ষে যত জোরে টান দিয়াছিল তত জোরেই সে দৈবশক্তির দিকে ছুটিয়াছে। এমন দিন আসিল যেদিন মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধের প্রতি বৌদ্ধের নির্ভরের আর সীমা রহিল না। হোনের বলিয়াছেন, বড়ো বড়ো ভারী পাথর যেমন জাহাজকে আশ্রয় করিয়া অনায়াসে সমুদ্র পার হইয়া যায়, তেমনি পর্বতাকার পাপের বোঝা সত্ত্বেও আমরা অমিত বুদ্ধের দয়াবলেই জন্মমৃত্যুর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারি। হোনের স্পষ্টই বলেন, ‘কখনো মনে করিয়ো না আমরা স্বকর্মের বলে নিজের আন্তরিক ক্ষমতাতেই পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইতে পারি, অসাধুও বুদ্ধের শক্তি-প্রভাবে পরমগতি লাভ করে।’

এই-যে কথা উঠিল, বুদ্ধের প্রসাদ এবং শক্তিই আমাদের কাছে ত্রাণ করিতে পারে, এইখানেই মানবগুরুর অলৌকিক ক্ষমতা প্রথম স্বীকার করা হইয়াছে। অবশ্য, মানবকে এখানে যেভাবে কল্পনা করা হয় তাহাতে তাহার মানবত্বই থাকে না, সর্বত্রই গুরুবাদের সেই বিশেষত্ব; গুরুর মধ্যে এমন শক্তির আরোপ করা হয় যাহা মানুষের শক্তি নহে।

সুফিধর্মেও গুরুবাদের এইরূপ প্রবলতা দেখা যায়। অথচ বিশুদ্ধ মুসলমান-ধর্ম এই প্রকার গুরুবাদের বিরুদ্ধ। আমার বিশ্বাস, এশিয়াখণ্ডে মানবগুরুকে দৈবশক্তিসম্পন্ন ত্রাণকর্তা বলিয়া পূজা করিবার যে প্রথা চলিয়াছে বৌদ্ধধর্ম

হইতেই তাহার উৎপত্তি। সুফিধর্মের এই গুরুবাদ পুনশ্চ আমাদের দেশেই বাউল ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এমনি করিয়া বৌদ্ধধর্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া গুরুবাদ ও অবতারবাদ নব নব আকারে আবর্তিত হইতেছে।

বৌদ্ধধর্মেই মানবকে দেবতার স্থান প্রথম দেওয়া হইয়াছে। তাহার পর হইতে মানব সেই দেবসিংহাসনের অধিকার আর সহজে ছাড়িতে পারিতেছে না। মানুষের মন একবার যখন এই অদ্ভুত কল্পনায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তখন এই পথে চিন্তা প্রবাহিত হওয়ার বাধা সে আর দেখিতেছে না।

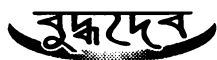
নাম জপ করা এবং নামাবলী-আবৃত্তিও আমরা মহাযান-বৌদ্ধসম্প্রদায়ে দেখিতে পাই। হোনের বলিয়াছেন, যে-কেহ সর্বান্তঃকরণে অমিতের নাম স্মরণ করিবে তাহাদের কেহই পুণ্যজীবনলাভে বঞ্চিত হইবে না। যে-কোনো প্রাণী বুদ্ধের নাম স্মরণ করে তাহাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, ইহাও হোনের উপদেশ। বস্তুত বুদ্ধই যখন বৌদ্ধের ভক্তির একমাত্র ও চরম লক্ষ্য তখন তাঁহার নামই তাহাদের প্রধান সম্বল হইয়াছিল। তিনি নাই, কিন্তু তাঁহার নাম আছে। মানুষের অভাবে মানুষের এই নামকে আশ্রয় না করিয়া উপায় কী?

বৌদ্ধধর্মে একদিন মুক্তির পথ অত্যন্ত দুর্গম ছিল, সংযম এবং ত্যাগের কঠোরতার সীমা ছিল না। এই বৌদ্ধধর্ম করুণাকে আদর করিয়াছে, কিন্তু ভক্তিকে অস্বীকার করিয়াছিল। সেই ভক্তি আসিয়া একদিন আপন অবমাননার প্রতিশোধ লইয়াছে। সাধনার সমস্ত কঠোরতা সে অপহরণ করিয়াছে। পাপের বোঝা লইয়াও মানুষ উদ্ধার পাইবে এই কথা প্রচার করিয়াছে, কেবল নাম-স্মরণে ও উচ্চারণেই মুক্তি হইতে পারে এই আশ্বাস দিয়া মানুষের পুণ্যচেষ্টাকে শিথিল করিয়া দিয়াছে। অবশেষে এই নামের মাহাত্ম্যে নির্ভর এত দূর পর্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, অজ্ঞানে ভ্রমক্রমে নামউচ্চারণ করিলেও মহাপাপী উদ্ধার পায় এমন বিশ্বাস ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

মানবপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত কোনো সত্যকে অবজ্ঞা করিয়া কোনো ধর্ম বাঁচে

না। জ্ঞানকে হতমান করিলে সে তাহার শোধ লয়, ভক্তিকে অপমান করিলে সে তাহা ক্ষমা করে না। যেখানে অভাব আছে পূরণ করিতে করিতে, যেখানে ক্রটি আছে সংশোধন করিতে করিতে, ধর্ম অগ্রসর হইয়া চলে। যদি না চলে তবে মানুষের উপায় নাই। এইজন্যই কোনো বড়ো ধর্মকে কোনো এককালে এক অবস্থায় এক ভাবে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে ঠিক দেখা হয় না। এক দিকে হেলিলে অন্য দিকে হেলিয়া সে আপনার ভারসাম্যস্ব্য উদ্ধার করে, কিন্তু তাই বলিয়া সেই দিকেই সে হেলিয়া থাকিতে পারে না— মধ্য পথকে আশ্রয় করিবার জন্যই তাহার চেষ্টা। একেবারেই না যদি করে তবে নৌকাডুবি।

বৌদ্ধধর্ম যে কী, তাহা নির্ণয় করিবার বেলায় তাহার সচলতার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। হীনযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে, মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে। বৌদ্ধধর্ম সংসারের অতীত কোনো পূজনীয় সত্তাকে স্বীকার যে করে না এ কথাকে আমরা বৌদ্ধধর্মের নিত্য সত্য বলিয়া মানি না— এবং বৌদ্ধধর্ম যে আত্মশক্তির সাধনাকে ভক্তির জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে এ কথাও তাহার চিরসত্য নহে। বৌদ্ধধর্ম এখনো মানুষের জ্ঞান ভক্তি কর্মের মধ্যে আপনার অমর সত্যকে বাধামুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সেই লক্ষ্য-অভিমুখে চলিয়াছে সকল ধর্মেরই গম্যস্থান যেখানে।



বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল, 'সে কথা যথার্থ— মানুষ দীন নহে, হীন নহে, কারণ মানুষের যে শক্তি— যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে, যাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।'

বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমূহূর্তের সুখ-দুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চারণ, ইহাই নবহিন্দুধর্মের মর্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল— মানুষের ক্ষুদ্র কাজে কর্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষলীলা, অত্যন্ত নিকটবর্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোটো-বড়োর ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল; প্রাকৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।

সন্তানের জন্য আমরা মানুষকে দুঃসাধ্যকর্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়াছি, অনেক জন্তুকেও সেরূপ দেখিয়াছি; স্বদেশীয়-স্বদেশের জন্যও আমরা মানুষকে দুরূহ চেষ্টা প্রয়োগ করিতে দেখিয়াছি, পিপীলিকাকেও মধুমক্ষিকাকেও সেরূপ দেখিয়াছি। কিন্তু মানুষের কর্ম যেখানে আপনাকে, আপনার সন্তানকে এবং আপনার দলকেও অতিক্রম করিয়া গেছে, সেইখানেই আমরা মনুষ্যত্বের পূর্ণশক্তির বিকাশে পরম গৌরব লাভ করিয়াছি। বুদ্ধদেবের করুণা সন্তান-বাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে— বৎস যেমন গাভীমাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে। ইহাই পরিপূর্ণতার চিত্র, ইহাই ঐশ্বর্য। ঈশ্বর প্রয়োজনবশত নহে, শক্তির অপরিসীম প্রাচুর্য-বশতই আপনাকে নির্বিশেষে নিয়তই বিশ্বরূপে দান করিতেছেন। মানুষের মধ্যেও যখন আমরা সেইরূপ শক্তির প্রয়োজনাভীত প্রাচুর্য ও স্বতঃপ্রবৃত্ত উৎসর্জন দেখিতে পাই, তখনই মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বিশেষভাবে অনুভব করি।

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে

এবম্পি সৰ্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং ॥

মেত্তঞ্চ সৰ্বলোকস্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং

উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ॥

তিট্ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা সয়ানো বা যাবতস্ বিগতমিদ্ধো

এতং সতিং অধিট্ঠৈয্যং ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাছ ॥

মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। উর্ধ্বদিকে অধোদিকে চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাইবে। কী দাঁড়াইতে কী চলিতে, কী বসিতে কী শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্র্যভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে— ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।

এই-যে ব্রহ্মবিহারের কথা ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন, ইহা মুখের কথা নহে; আমরা জানি, ইহা তাঁহার জীবনের মধ্যে হইতে সত্য হইয়া উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা লইয়া অদ্য আমরা গৌরব করিব। এই বিশ্বব্যাপী চিরজাগ্রত করুণা, এই ব্রহ্মবিহার, এই সমস্ত-আবশ্যকের -অতীত অহেতুক অপরিমেয় মৈত্রীশক্তি, মানুষের মধ্যে কেবল কথার কথা হইয়া থাকে নাই, ইহা কোনো-না-কোনো স্থানে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তিকে আর আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না; এই শক্তি মনুষ্যত্বের ভাঙারে চিরদিনের মতো সঞ্চিত হইয়া গেল। যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের অপরিাপ্ত দয়াশক্তির এমন সত্যরূপে বিকাশ হইয়াছে, আপনাকে সেই মানুষ জানিয়া উৎসব করিতেছি।

১৩১১

৩

বুদ্ধদেব যখন বেদনাপূর্ণচিত্তে ধ্যানদ্বারা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন যে, মানুষের বন্ধন বিকার বিনাশ কেন, দুঃখ জরা মৃত্যু কেন, তখন তিনি কোন্ উত্তর পেয়ে আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন? তখন তিনি এই উত্তরই পেয়েছিলেন যে, মানুষ আত্মাকে উপলব্ধি করলেই, আত্মাকে প্রকাশ করলেই, মুক্তিলাভ করবে। সেই প্রকাশের বাধাতেই তার দুঃখ, সেইখানেই তার পাপ।

এইজন্যে তিনি প্রথমে কতকগুলি নিষেধ স্বীকার করিয়ে মানুষকে শীল গ্রহণ করতে আদেশ করেন। তাকে বললেন, ‘তুমি লোভ কোরো না, হিংসা কোরো না, বিলাসে আসক্ত হোয়ো না।’ যে-সমস্ত আবরণ তাকে বেষ্টন করে ধরেছে সেইগুলি প্রতিদিনের নিয়ত অভ্যাসে মোচন করে ফেলবার জন্যে তাকে উপদেশ দিলেন। সেই আবরণগুলি মোচন হলেই আত্মা আপনার বিশুদ্ধ স্বরূপটি লাভ করবে।

সেই স্বরূপটি কী? শূন্যতা নয়, নৈষ্কর্ম্য নয়। সে হচ্ছে মৈত্রী, করুণা, নিখিলের প্রতি প্রেম। বুদ্ধ কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেননি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। কারণ, এই প্রেমকে বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপকে পায়। সূর্য যেমন আলোককে বিকীর্ণ করার দ্বারাই আপনার স্বভাবকে পায়।

৯ চৈত্র ১৩১৫

বুদ্ধদেব যে দুঃখনিবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছেন সে পথের একটা সকলের চেয়ে বড়ো আকর্ষণ কী? সে এই যে, অত্যন্ত দুঃখ স্বীকার করে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এই দুঃখ-স্বীকারের দ্বারা মানুষ আপনাকে বড়ো করে জানে। খুব বড়ো রকম করে ত্যাগ, খুব বড়ো রকম করে ব্রত পালনের মাহাত্ম্য মানুষের শক্তিকে বড়ো করে দেখায় বলে মানুষের মন তাতে ধাবিত হয়।

১৪ চৈত্র [১৩১৫]

বুদ্ধদেব শূন্যকে মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাই নে। কিন্তু তিনি মঙ্গলসাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্বচরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর মুক্তির সাধনাই ছিল স্বার্থত্যাগ অহংকারত্যাগ ক্রোধত্যাগের সাধনা, ক্ষমার সাধনা, দয়ার সাধনা, প্রেমের সাধনা। এমনি করে প্রেম যখন অহং'এর শাসন অতিক্রম করে বিশ্বের মধ্যে অনন্তের মধ্যে মুক্ত হয় তখন সে যা পায় তাকে যে নামই দাও-না কেন সে কেবল ভাষার বৈচিত্র্য মাত্র, কিন্তু সেই-ই মুক্তি। এই প্রেম যা যেখানে আছে কিছুকেই ত্যাগ করে না; সমস্তকেই সত্যময় ক'রে, পূর্ণতম ক'রে উপলব্ধি করে। নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোনো বাধাই মানে না।

৭ বৈশাখ [১৩১৬]

বিশেষ স্থানে গিয়ে, বিশেষ মন্ত্র প'ড়ে, বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তিলাভ করা যায়, এই বিশ্বাসের অরণ্যে যখন মানুষ পথ হারিয়েছিল তখন বুদ্ধদেব এই অত্যন্ত সহজ কথাটি আবিষ্কার ও প্রচার করবার জন্যে এসেছিলেন যে, স্বার্থত্যাগ করে, সর্বভূতে দয়া বিস্তার করে, অন্তর থেকে বাসনাকে ক্ষয় করে ফেললে তবেই মুক্তি হয়; কোনো স্থানে গেলে, বা জলে স্নান করলে, বা

অগ্নিতে আহুতি দিলে, বা মন্ত্ৰ উচ্চারণ করলে হয় না। এই কথাটি শুনতে নিতান্তই সরল, কিন্তু এই কথাটির জন্যে একটি রাজপুত্রকে রাজ্যত্যাগ করে বনে বনে, পথে পথে, ফিরতে হয়েছে।

৭ পৌষ [১৩১৬]

৭

বুদ্ধদেবের আসল কথাটা কী সেটা দেখতে গেলে তাঁর শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ সে দিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না— যে অংশ পজেটিভ সেইখানেই তাঁর আসল পরিচয়। যদি দুঃখ-দূরই চরম কথা হয় তা হলে বাসনা-লোপের দ্বারা অস্তিত্বলোপ করে দিলেই সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়— কিন্তু মৈত্রীভাবনা কেন? মৃত্যুদণ্ডই যার উপর বিধান তার আর ভালোবাসা কেন, দয়া কেন? এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ভালোবাসাটার দিকেই আসল লক্ষ্য— আমাদের অহং, আমাদের বাসনা স্বার্থের দিকে টানে— বিশুদ্ধ প্রেমের দিকে, আনন্দের দিকে নয়— এইজন্যই অহংকে নির্বাপিত করে দিলেই সহজেই সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে। আমার “পূর্ণিমা” বলে ‘চিত্রা’র একটা কবিতা পড়েছ? তাতে আছে, একদিন সন্ধ্যার সময় বোটে বসে সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি ইংরেজি বই পড়তে পড়তে ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে যেমনি বাতি নিভিয়ে দিলুম অমনি দেখি নৌকার সমস্ত জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নার ধারা এসে আমার কক্ষ প্রাবিত করে দিলে। ঐ ছোট্ট একটি বাতি আমার টেবিলে জ্বলছিল বলে আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না সৌন্দর্য দ্যুলোক ভুলোক আচ্ছন্ন করে অপেক্ষা করছিল তা আমি জানতেও পারিনি। অহং আমাদের সেইরকম জিনিস-অত্যন্ত কাছে এই জিনিসটা আমাদের সমস্ত বোধশক্তিকে চারদিক থেকে এমনি আবৃত করে রেখেছে যে অনন্ত-আকাশ-ভরা অজস্র আনন্দ আমরা বোধ করতেই পারছি নে—এই অহংটার যেমনি নির্বাণ হবে অমনি অনির্বচনীয় আনন্দ এক মুহূর্তে আমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হবেন। সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায় যখন দেখি তিনি লোকলোকান্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলছেন। জগতে যে

অনন্ত আনন্দ বিরাজমান তারও যে ঐ প্রকৃতি- সে যে যেখানে যা-কিছু আছে সমস্তর প্রতি অপরিমেয় প্রেম। এই জগদ্ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়, এই শিক্ষা দিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন- নইলে মানুষ বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্ত্বকথা শোনবার জন্য কখনোই তাঁর চার দিকে ভিড় করে আসত না।

৯ জ্যৈষ্ঠ [১৩১৮]

৮

বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।

তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনি আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি; পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।

১৩১৯

৯

বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। ইহা আর্য-ভারতবর্ষ ও হিন্দু-ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। বৌদ্ধযুগে সেই-সকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি একধর্মবন্যায় ভাঙিয়াছিল- শুধু তাই নয়, বাহিরের নানা জাতি এই ধর্মের আশ্রানে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল। তার পরে এই মিশ্রণকে যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া করিয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলিয়াছে। বৈদিকযুগ ও হিন্দুযুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য আছে তাহার মাঝখানের সন্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ। এই যুগে আর্য ও অনার্য এক গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে উভয়ের মানসপ্রকৃতি ও বাহ্য আচারের মধ্যে আদান-

প্রদান ও রক্ষানিম্পত্তির চেষ্টা হইতে থাকে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন; তাই সকল দিকেই বেশ সুসংগত রকমে রক্ষা হইয়া গিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। আভ্যন্তরিক নানা অসংগতির জন্য আমরা অন্তরে বাহিরে দুর্বল রহিয়াছি; সামাজিক ব্যবহারে এবং ধর্মবিশ্বাসে পদে পদেই বিচার-বুদ্ধিকে অন্ধ করিয়া আমাদের চলেতে হয়— যাহা-কিছু আছে তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা মিলাইয়া লওয়া নহে, অভ্যাসের দ্বারা মানিয়া লওয়াই আমরা প্রধানত আশ্রয় করিয়াছি। যাহাই হউক, আমাদের এই বর্তমান যুগকে যদি ঠিকমত চিনিতে হয় তবে পূর্ববর্তী সন্ধিযুগের সঙ্গে আমাদের ভালোরূপ পরিচয় হওয়া চাই। একটা কারণে আমাদের দেশে এই পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের যে সম্প্রদায়ের রূপটিকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়া আলোচনা করিয়া থাকেন তাহা হীনযান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়াছে। মহাযান সম্প্রদায়ে বৌদ্ধধর্মের হৃদয়ের দিকটা প্রকাশ করে। সেইজন্য মানব-ইতিহাসের সৃষ্টিতে এই সম্প্রদায়ই প্রধানতর। শ্যাম, চীন, জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশে এই মহাযান সম্প্রদায়ই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এইজন্যই মহাযান সম্প্রদায় এমন একটা প্রণালীর মতো হইয়াছিল যাহার ভিতর দিয়া নানা জাতির নানা ক্রিয়াকর্ম মন্ত্রতন্ত্র পূজার্চনা ভারতে প্রবাহিত এবং এক মন্তনদণ্ডের দ্বারা মথিত হইয়াছে। এই মহাযান সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগুলিকে আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের পুরাণগুলির সঙ্গে সকল বিষয়েই তাহার আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সাদৃশ্যের কিছু অংশ বৌদ্ধধর্মের নিজেরই বিশুদ্ধ স্বরূপগত, কিন্তু অনেকটা ভারতের অবৈদিক সমাজের সহিত মিশ্রণজনিত। এই মিশ্রণের উপাদানগুলি নূতন নহে; ইহারাও অনেক কালের পুরাতন, মানবের শিশুকালের সৃষ্টি। দিনের বেলায় যেমন তারা দেখা যায় না তেমনি বৈদিক কালের সাহিত্যে এগুলি প্রকাশ পায় নাই, দেশের মধ্যে ইহারা ছড়ানো ছিল। বৌদ্ধযুগে যখন নানা জাতির সংমিশ্রণ হইল তখন ক্রমশ ইহাদের প্রভাব জাগিয়া উঠিল এবং বৌদ্ধযুগের শেষভাগে ইহারাই আর-সমস্তকে ঠেলিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সেই ভিড়ের মধ্যে শৃঙ্খলা করিবার চেষ্টা, যাহা নিতান্ত অনার্য তাহাকে আর্যবেশ পরাইবার প্রয়াস, ইহাই হিন্দুযুগের ঐতিহাসিক সাধনা।

একদিন বুদ্ধ বললেন, আমি সমস্ত মানুষের দুঃখ দূর করব। দুঃখ তিনি সত্যিই দূর করতে পেরেছিলেন কি না সেটি বড়ো কথা নয়; বড়ো কথা হচ্ছে তিনি এটি ইচ্ছা করেছিলেন, সমস্ত জীবের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতবর্ষ ধনী হোক, প্রবল হোক, এ তাঁর তপস্যা ছিল না; সমস্ত মানুষের জন্য তিনি সাধনা করেছিলেন। আজ ভারতের মাটিতে আবার সেই সাধনা জেগে উঠুক, সেই ইচ্ছাকে ভারতবর্ষ থেকে কি দূর করে দেওয়া চলে!

১৭ ভাদ্র ১৩৩১

ভারতবর্ষের সত্যের ঐশ্বর্যকে জানতে হলে সমুদ্রপারে ভারতবর্ষের সুদূর দানের ক্ষেত্রে যেতে হয়। আজ ভারতবর্ষের ভিতরে বসে ধূলিকলুষিত হাওয়ার ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষকে যা দেখি তার চেয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে ভারতবর্ষের নিত্যকালের রূপ দেখতে পারব ভারতবর্ষের বাইরে থেকে।

চীনে গেলাম। দেখলাম জাত হিসাবে তারা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নাকে চোখে ভাষায় ব্যবহারে তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিলই নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে এমন একটি গভীর আত্মীয়তার যোগ অনুভব করা গেল, যা ভারতবর্ষীয় অনেকের সঙ্গে করা কঠিন হয়ে উঠেছে। এই যোগ রাজশক্তির দ্বারা স্থাপন করা হয় নি; এই যোগ উদ্যত তরবারির জোরেও নয়; এই যোগ কাউকে দুঃখ দিয়ে নয়, নিজে দুঃখ স্বীকার করে। অত্যন্ত পরের মধ্যেও যে সত্যের বলে অত্যন্ত আত্মীয়তা স্বীকার করা সম্ভব হয় সেই সত্যের জোরেই চীনের সঙ্গে সত্যভারতের চিরকালের যোগবন্ধন বাঁধা হয়েছে। এই সত্যের কথা বিদেশী পলিটিক্সের ইতিহাসে স্থান পায় নি বলে আমরা একে অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি নে। কিন্তু একে বিশ্বাস করবার প্রমাণ ভারতের বাইরে সুদূর দেশে আজ ও রয়ে গেছে।

জাপানে প্রতিদিনের ব্যবহারে জাপানির সুগভীর ধৈর্য, আত্মসংযম, তার রসবোধের বিচিত্র পরিচয়ে যখন বিস্মিত হতেছিলাম তখন এ কথা কতবার

শুনছি যে, এই-সকল গুণের প্রেরণা অনেকখানি বৌদ্ধধর্মের যোগে ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। সেই মূল প্রেরণা স্বয়ং ভারতবর্ষ থেকে আজ লুপ্তপ্রায় হল। সত্যের যে বন্যা একদিন ভারতবর্ষের দুই কূল উপচিয়ে দেশে দেশে বয়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের প্রবাহিণীতে আজ তা তলায় নেমে এসেছে, কিন্তু তার জলসঞ্চয় আজও দূরের নানা জলাশয়ে গভীর হয়ে আছে। এই কারণেই সেই-সকল জায়গা আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে তীর্থস্থান। কেননা, ভারতবর্ষের ধ্রুব পরিচয় সেই-সব জায়গাতেই।

শ্রাবণ [১৩৩৪]

১২

বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে জনসাধারণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে; এর মধ্যে শুদ্ধ মানুষের নয়, অন্য জীবেরও যথেষ্ট স্থান আছে। জাতক-কাহিনীর মধ্যে খুব একটা মস্ত কথা আছে; তাতে বলেছে, যুগ-যুগ ধরে বুদ্ধ সর্বসাধারণের মধ্য দিয়েই ক্রমশ প্রকাশিত। প্রাণীজগতে নিত্যকাল ভালো-মন্দ'র যে দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বের প্রবাহ ধরেই ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বুদ্ধের মধ্যে অভিব্যক্ত। অতি সামান্য জন্তুর ভিতরেও অতি সামান্যরূপেই এই ভালোর শক্তি মন্দ'র ভিতর দিয়ে নিজেকে ফুটিয়ে তুলছে; তার চরম বিকাশ হচ্ছে অপরিমেয় মৈত্রীর শক্তিতে আত্মত্যাগ। জীবে জীবে লোকে লোকে সেই অসীম মৈত্রী অল্প অল্প করে নানা দিক থেকে আপন গ্রন্থি মোচন করছে, সেই দিকেই মোক্ষের গতি। জীব মুক্ত নয়, কেননা আপনার দিকেই তার টান; সমস্ত প্রাণীকে নিয়ে ধর্মের যে অভিব্যক্তি তার প্রণালীপরম্পরায় সেই আপনার দিকে টানের 'পরে আঘাত লাগছে। সেই আঘাত যে পরিমাণে যেখানেই দেখা যায় সেই পরিমাণে সেখানেই বুদ্ধের প্রকাশ। মনে আছে, ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, দড়িতে বাঁধা ধোপার বাড়ির গাধার কাছে এসে একটি গাভী ন্নিষ্ক চক্ষে তার গা চেটে দিচ্ছে; দেখে আমার বড়ো বিস্ময় লেগেছিল। বুদ্ধই যে তাঁর কোনো-এক জন্মে সেই গাভী হতে পারেন, এ কথা বলতে জাতক-কথা-লেখকের একটুও বাধত না। কেননা, গাভীর এই স্নেহেরই শেষ গিয়ে পৌঁচেছে মুক্তির মধ্যে। জাতক-কথায় অসংখ্য সামান্যের মধ্যে দিয়েই চরম অসামান্যকে স্বীকার করেছে। এতেই সামান্য এত বড়ো হয়ে উঠল।

সেইজন্যেই এত বড়ো মন্দিরভিত্তিক গায়ে গায়ে তুচ্ছ জীবনের বিবরণ এমন সরল ও নির্মল শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। ধর্মেরই প্রকাশচেষ্টার আলোতে সমস্ত প্রাণীর ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহিমান্বিত।

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ [১৩৩৪]

১৩

বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন, সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য হিংসাশূন্য শত্রুতাশূন্য মানসে অপরিমাণ মৈত্রী পোষণ করবে। দাঁড়াতে বসতে চলতে শুতে, যাবৎ নিদ্রিত না হবে, এই মৈত্রী-স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকবে—একেই বলে ব্রহ্মবিহার। এত বড়ো উপদেশ মানুষকে দেওয়া চলে। কেননা, মানুষের মধ্যে গভীর হয়ে আছে সোহহংতত্ত্ব। সে কথা বুদ্ধদেব নিজের মধ্যে থেকেই জেনেছেন, তাই বলেছেন, অপরিমাণ প্রেমেই আপনার অন্তরের অপরিমেয় সত্যকে মানুষ প্রকাশ করে।

অর্থববেদ বলেন, তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষমিদং ব্রহ্মেতি মন্যতে— যিনি বিদ্বান্ তিনি মানুষকে তার প্রত্যক্ষের অতীত বৃহৎ বলেই জানেন। সেইজন্যে তিনি তার কাছে প্রত্যাশা করতে পারেন দুঃসাধ্য কর্মকে, অপরিমিত ত্যাগকে। যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্— যারা ভূমাকে জানেন মানুষে, তাঁরা জানেন পরম দেবতাকেই। সেই মানবদেবতাকে মানুষের মধ্যে জেনেছিলেন বলেই বুদ্ধদেব উপদেশ দিতে পেরেছিলেন—

মাতা যথা নিয়ং পুত্রং আয়ুসা একপুত্রমনুরক্থে

এবম্পি সৰ্বভূতেসু মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং।

মা যেমন আপন আয়ু ক্ষয় করেই নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপরিমাণ দয়াভাব জন্মাবে। মাথা গ'নে বলব না, কজন এই উপদেশ পালন করতে পারে। সেই গণনায় নয় সত্যের বিচার। মানুষের অসীমতা যিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি মাথা গোনবার। তিনি অসংকোচে মানুষের মহামানবকে আহ্বান করেছিলেন; বলেছিলেন, অপরিমাণ ভালোবাসায় প্রকাশ করো আপনার অন্তরে ব্রহ্মকে। এই বাণী অসংকোচে সকলকে শুনিয়ে তিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করেছিলেন।

[১৩৩৯]

বুদ্ধ জন্মোৎসব

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোরকুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর', প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ।

এসো দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা-
মহাভিক্ষু, লও সবার অহংকার ভিক্ষা ।
লোক লোক ভুলুক শোক, খণ্ডন কর' মোহ,
উজ্জ্বল হোক জ্ঞানসূর্য-উদয়-সমারোহ-
প্রাণ লভুক সকল ভূবন, নয়ন লভুক অন্ধ ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ।

ক্রন্দনময় নিখিলহৃদয় তাপদহনদীপ্ত,
বিষয়বিষবিকারজীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত ।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্ধানি,
তব মঙ্গলশঙ্ক আন' তব দক্ষিণ পাণি-
তব শুভসংগীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ ।

শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ।

বুদ্ধদেব

ମହମ୍ମଦ ଶୁକ୍ର. ଗୁରୁ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ।

ਅਮਰਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼।

ଦୟା ନାମ ଓଡ଼ିଆ !

ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ,

ਬੰਦਾ ਘੁੱਟ, ਬੰਦਾ ਘੁੱਟ!

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାତା,

५. अहं ५. अहं ५. अहं ५. अहं ५. अहं

५५ अथ ५४ अथ

ਮਰਾ ਜਾਨੀ, ਮਰਾ ਆਮ,

ਮੇਰਾ ਬੂਟਾ, ਮੇਰਾ ਲੁਖਾ !

আল্লাহর আর পুঙ্খ, সাক্ষিও চিত্র আল্লাহ,

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

कन्दनरूप, भागि शरण,

पुनर्जिउं नरुं २२५५

ਮਾਤ੍ਰ ਦੁ:ਖਵੱਧਤਾ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ ਪਰਿਛੇਦ ।

ਜਪ ਕਰਿ ੭੫ ਜਪੁ !

મહાનિદ્રા, મહાનિદ્રા,

महाराज, महाराज!

ଜିଜ୍ଞାସୁ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

সকলকলুষতামসহর

সকল কলুষতামস হর',

জয় হোক তব জয় ।

অমৃতবারি সিঞ্চন কর'

নিখিল ভূবনময় ।

মহাশান্তি, মহাক্ষেম,

মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

জ্ঞানসূর্য-উদয়ভাতি

ধ্বংস করুক তিমিররাতি,

দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি

অপগত কর' ভয় ।

মহাশান্তি, মহাক্ষেম,

মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

মোহমলিন অতিদুর্দিন-

শঙ্কিতচিত পাত্ত

জটিলগহনপথসংকট-

সংশয়-উদ্ভ্রান্ত ।

করুণাঘন, মাগি শরণ-

দুর্গতিভয় করহ হরণ,

দাও দুঃখবন্ধতরণ

মুক্তির পরিচয় ।

মহাশান্তি, মহাক্ষেম,

মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!

বুদ্ধদেব

বুদ্ধদেবের প্রতি

সারনাথে মূলগন্ধকুটিবিহার-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রচিত

ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি ।

সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি ।

বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ-
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি ।

চিন্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান ।

তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান্ ।

খুলে যাক রুদ্ধ দ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত-অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি-
এনে দিক অজেয় আহবান ।

দার্জিলিং

২৪ অক্টোবর ১৯৩১ [১৩৩৮]

বোরোবুদুর

সেদিন প্রভাতে সূর্য এইমত উঠেছে অম্বরে
অরণ্যের বন্দনমর্মরে;
নীলিম বাষ্পের স্পর্শ লভি
শৈলশ্রেণী দেখা দেয় যেন ধরণীর স্বপ্নছবি।

নারিকেলবনপ্রান্তে নরপতি বসিল একাকী
ধ্যানমগ্ন-আঁখি।
উচ্চে উচ্ছ্বসিল প্রাণ অন্তহীন আকাজ্জ্বাতে,
কী সাহসে চাহিল পাঠাতে
আপন পূজার মন্ত্র যুগ-যুগান্তরে।
অপরূপ অমৃত অক্ষরে
লিখিল বিচিত্র লেখা; সাধকের ভক্তির পিপাসা
রচিল আপন মহাভাষা—
সর্বকাল সর্বজন
আনন্দে পড়িতে পারে যে ভাষার লিপির লিখন।

সে লিপি ধরিল দ্বীপ আপন বক্ষের মাঝখানে,
সে লিপি তুলিল গিরি আকাশের পানে।
সে লিপির বাণী সনাতন
করেছে গ্রহণ
প্রথম-উদিত সূর্য শতাব্দীর প্রত্যহ প্রভাতে।

বুদ্ধদেব

অদূরে নদীর কিনারাতে
আল-বাঁধা মাঠে
কত যুগ ধরে চাষী ধান বোনে আর ধান কাটে—
আঁধারে আলোয়
প্রত্যহের প্রাণলীলা সাদায় কালোয়
ছায়ানাটো ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে,
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে ।
কালের সে লুকাচুরি, তারি মাঝে সংকল্প সে কার
প্রতিদিন করে মন্তোচ্চার,
বলে অবিশ্রাম—
‘বুদ্ধের শরণ লইলাম’ ।

প্রাণ যার দুদিনের, নাম যার মিলালো নিঃশেষে
সংখ্যাভীত বিস্মৃতির দেশে,
পাষাণের ছন্দে ছন্দে বাঁধিয়া গেছে সে
আপনার অক্ষয় প্রণাম—
‘বুদ্ধের শরণ লইলাম’ ।

কত যাত্রী কত কাল ধ’রে
নম্রশিরে দাঁড়ায়েছে হেথা করজোড়ে ।
পূজার গম্ভীর ভাষা খুঁজিতে এসেছে কতদিন
তাদের আপন কণ্ঠ ক্ষীণ ।
ইঙ্গিতপুঞ্জিত তুঙ্গ পাষাণের সংগীতের তানে
আকাশের পানে
উঠেছে তাদের নাম,
জেগেছে অনন্ত ধ্বনি ‘বুদ্ধের শরণ লইলাম’ ।

বুদ্ধদেব

অর্থ আজ হারায়েছে সে যুগের লিখা,
নেমেছে বিস্মৃতিকুহেলিকা ।
অর্থ্যা শূন্য কৌতূহলে দেখে যায় দলে দলে আসি
ভ্রমণবিলাসী—
বোধশূন্য দৃষ্টি তার নিরর্থক দৃশ্য চলে গ্রাসি ।
চিন্তা আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে,
হৃদয় নীরস অহংকারে ।
ক্ষিপ্ৰগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা,
কম্পমান ধরা ।
বেগ শুধু বেড়ে চলে উর্ধ্বশ্বাসে মৃগয়া-উদ্দেশে—
লক্ষ্য ছোটে পথে পথে, কোথাও পৌঁছে না পরিশেষে ।
অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া ।
তাই আসিয়াছে দিন,
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র ‘বুদ্ধের শরণ লইলাম’ ।

বোরোবুদুর । যবদ্বীপ

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৭ [১৩৩৪]



সিয়াম

প্রথম দর্শনে

ত্রিশরণ মহামন্ত্র যবে

বজ্রমন্ত্ররবে

আকাশে ধ্বনিতেছিল পশ্চিমে পূর্বে,

মরুপারে, শৈলতটে, সমুদ্রের কূলে উপকূলে,

দেশে দেশে চিত্তদ্বার দিল যবে খুলে

আনন্দমুখর উদ্বোধন—

উদ্দাম ভাবের ভার ধরিতে নারিল যবে মন,

বেগ তার ব্যাণ্ড হল চারি ভিতে,

দুঃসাধ্য কীর্তিতে কর্মে, চিত্রপটে মন্দিরে মূর্তিতে,

আত্মদানসাধনস্ফূর্তিতে,

উচ্ছ্বসিত উদার উজ্জ্বলিতে,

স্বার্থঘন দীনতার বন্ধনমুক্তিতে—

সে মন্ত্র অমৃতবাণী, হে সিয়াম, তব কানে

কবে এল কেহ নাহি জানে

অভাবিত অলক্ষিত আপনাবিস্মৃত শুভক্ষণে

দূরাগত পান্থ সমীরণে ।

সে মন্ত্র তোমার প্রাণে লভি প্রাণ

বহু শাখা প্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান ।

সে মন্ত্র—ভারতী

দিল অস্থলিত গতি

কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে—

শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে

বুদ্ধদেব

এক ধ্রুপকেন্দ্র-সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে—
সর্বজনগণে তব এক করি একাত্ম ভক্তিতে—
এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে ।

সে বাণীর সৃষ্টিক্রিয়া নাহি জানে শেষ
নবযুগযাত্রাপথে দিবে নিত্য নতুন উদ্দেশ ।
সে বাণীর ধ্যান
দীপ্যমান করি দিবে নব নব জ্ঞান
দীপ্তির ছটায় আপনার,
এক সূত্রে গাঁথি দিবে তোমার মানসরত্নহার ।

হৃদয়ে হৃদয়ে মিল করি
বহু যুগ ধরি
রচিয়া তুলেছ তুমি সুমহৎ জীবনমন্দির,
পদ্মাসন আছে স্থির,
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন—
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর স করুণ সান্ত্বনার ধারা ।

আমি সেথা হতে এনু যেথা ভগ্নস্তুপে
বুদ্ধের বচন রুদ্ধ দীর্ঘকীর্ণ মূক শিলারূপে,
ছিল যেথা সমাচ্ছন্ন করি
বহু যুগ ধরি
বিস্মৃতিকুয়াশা

বুদ্ধদেব

ভক্তির-বিজয়স্তম্ভে-সমুৎকীর্ণ অর্চনার ভাষা ।
সে অর্চনা সেই বাণী
আপন সজীব মূর্তিখানি
রাখিয়াছে ধ্রুব করি শ্যামল সরস বক্ষে তব,
আজি আমি তারে দেখি লব ।

ভারতের যে মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন-অঙ্গন-সীমা
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে ।
স্নিগ্ধ করি প্রাণ
তীর্থজলে করি স্নান
তোমার জীবনধারাস্রোতে,
যে নদী এসেছে বহি ভারতের পুণ্যযুগ হতে—
যে যুগের গিরিশৃঙ্গ'-পর
একদা উদিয়াছিল প্রেমের মঙ্গলদিনকর ।

ব্যাক্কক

১১ অক্টোবর ১৯২৭ [১৩৩৪]

গ্রন্থ পরিচয়

রচনা	আকঙ্কুর গ্রন্থ পত্রিকা ও প্রবন্ধ
প্রার্থনা	বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৪০
বুদ্ধদেব	প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪২
ব্রহ্মবিহার	শান্তিনিকেতন ১
বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ	তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পৌষ ১৩১৮
বুদ্ধদেব-প্রসঙ্গ :	

১	বিচিত্র প্রবন্ধ	:	মন্দির
২	ধর্ম	:	উৎসবের দিন
৩	শান্তিনিকেতন ১	:	আদেশ
৪	শান্তিনিকেতন ১	:	ভূমা
৫	শান্তিনিকেতন ১	:	মুক্তির পথ
৬	শান্তিনিকেতন ২	:	ভক্ত
৭	প্রবাসী, মাঘ ১৩৪৮	:	মৈত্রীসাধন
৮	পথের সঞ্চয়	:	যাত্রার পূর্বপত্র
৯	ইতিহাস	:	ভারত-ইতিহাস-চর্চা
১০	বিশ্বভারতী	:	১১-সংখ্যক প্রবন্ধ
১১	কালান্তর	:	বৃহত্তর ভারত
১২	জাভায়াত্রীর পথ	:	১৯ সংখ্যক পত্র
১৩	মানুষের ধর্ম	:	তৃতীয় অধ্যায়

বুদ্ধজন্মোৎসব নটীর পূজা (পৌষ ১৩৩৮)

সকলকলুষতামসহর

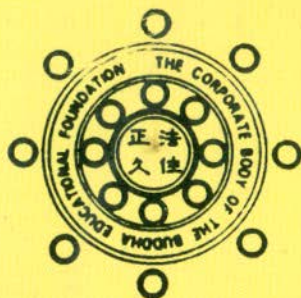
নটীর পূজা

বুদ্ধদেবের প্রতি পরিশেষ

বোরোবুদুর পরিশেষ

সিয়াম : প্রথম দর্শনে

পরিশেষ



Reprinted and donated by

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11th Floor, 55, Hang Chow S. Rd. Sec1, Taipei, Taiwan R.O.C.

Tel : (02) 3913415

Printed in Taiwan (This book is not to be sold.)